এক

বহুদিন পর এক উজ্জ্বল আলোর প্রত্যাশায় আবার আনন্দে দুলে উঠেছিলো পৃথিবী। বুঝি বাতাসের কাছ থেকে শুনতে পেয়েছিলো সেই গোপন সংবাদ। প্রকৃতি পেয়েছিলো নতুন জীবন।

অজ্ঞ মানুষ কেবল জানতে পারেনি সেদিন সেই মানুষের শুভাগমনের খবর- যার আগমনে বহুদিন বহুবছর বহুকাল পর মানুষের এই পৃথিবীতে অন্ধকার ভীষণ ভয় পেয়ে আবার কাঁপতে থাকে, আলোকের আদিগন্ত উন্মোচনে দিশেহারা হয়ে পালাতে থাকে অন্ধকার। সেই আলোকে যখন দশদিগন্ত উদ্ভাসিত হয়ে উঠে, তখন বিভ্রান্ত মানুষ জানতে পারে তাঁর আগমনের সংবাদ। কারণ, অন্ধকারের বিরুদ্ধে জেহাদ করার জন্যই যে তাঁর আগমন। সেই অন্ধকার যখন বিদূরিত হতে থাকে, তখন মানুষ জেনে যায় আলোর খবর– সে আলো ছড়িয়ে পড়ে সবখানে।

আলোর সেই শামাদান হৃদয়ে ধরে তিনি এসেছেন। সে শামাদান জ্বলছে। আল্লাহ্ প্রেমের অনির্বাণ প্রদীপ হয়ে জ্বলছে। যে প্রেমে জেগে উঠেছিলো একবার মক্কার ময়দান, কথা ক'য়ে উঠেছিলো মদীনার মাটি। যে প্রেম বার বার জ্বলে। যুগে যুগে জ্বলে উঠে পৃথিবীর বিশাল প্রান্তরে, কখনো আরবে, কখনো আজমে, কখনো মরুতে, কখনো শ্যামল প্রান্তরে।

আল্লাহ্পাকের ইচ্ছা– আবার জ্বলে উঠুক বিশ্বপ্রেমের সেই আলো। তাঁর লীলাখেলা কেউ বুঝে না। তিনি যা ইচ্ছা করেন তাই হয়। আমরা তা বুঝতে পারি না। একমাত্র তিনিই জানেন, কখন কি করতে হবে এবং সে ভাবেই সবকিছু হতে থাকে। তিনি প্রেমের বাণী দিয়ে পাঠালেন তাঁর মেহমানকে। বুকে তাঁর প্রেমের প্রদীপ। চোখে রহস্যাচ্ছন্ন জ্যোতিচ্ছটা। জান্নাতি পবিত্রতা নিয়ে সেই মেহমান এলেন– নতুন মেহমান।

মেহমানের নাম মোহাম্মদ বাকী। নগরীর নাম কাবুল। সেই নয়শ' একাত্তর হিজরীর কাবুল।

কাবুলের সেই নিভৃত কুটিরের মালিকের নাম কাজী আবদুস্ সালাম। কাজী আবদুস্ সালাম জ্ঞানী, গুণী, কুসুমের মতো পবিত্র হৃদয়ের অধিকারী। তিনি মোহাম্মদ বাকীর পিতা। তিনি কাঁদতেন। প্রায় সময়ই আল্লাহ্র দরবারে মোনাজাত করতে গিয়ে চোখের পানি ফেলতেন। সেই চোখের পানির অলিখিত নিবেদনে তিনি আল্লাহ্র কাছে কি চাইতেন, কি বলতেন কে জানে। সেই চোখের পানিই আজ তাঁর প্রার্থনার ইচ্ছা হয়ে তাঁর ঘরে ফিরে এসেছে যেনো। আল্লাহ্প্রেমের সেই সব অশ্রুকে মুক্তায় রূপান্তরিত করে আল্লাহ্পাক বুঝি তাঁকে উপহার দিয়েছেন। সেই পবিত্র উপহারের নাম মোহাম্মদ বাকী। হজরত খাজা মোহাম্মদ বাকী বিল্লাহ্ রহ.।

দুই

আল্লাহ্র খাস মেহমান তো আর দশজনের মতো হতে পারেন না। তাই বুঝি তিনি অন্য বালকের মতো নন। স্বভাবে তাঁর চঞ্চলতা নেই।

যেনো নীরব প্রান্তরের মতো। মৌন পাহাড়ের মতো। অকৃপণ প্রকৃতির সঙ্গে যেনো তাঁর ভাবের আদান প্রদান হয়। কথা বিনিময় হয়।

তিনি শিখতে চান। জানতে চান। নিসর্গের অসংখ্য নীরব পাতার দিকে চেয়ে থাকেন। এই বিরাট পুস্তকের পাতায় কি লেখা আছে? আসমানের নীলে, চাঁদের স্নিগ্ধচ্ছটায়, অজস্র তারার আলোক মালায় কি সব লেখা আছে যেনো।

দিগ্-দিগন্তে, উষার আবছা আলোয়, কিংবা দিন দিনান্তে কিসব ছবি আঁকা হয় যেনো। সে সব দেখে যেনো তাঁর মন ভরে না।

তবু কেতাবের দিকে দৃষ্টি ফেরাতে হয়। কেতাব খুলতে হয়। এ কেতাব যে তাঁরই কাছ থেকে এসেছে। আল-কোরআন যার নাম।

তবুও জানতে হয়। কেতাব মেলতে হয়। সেই কেতাব যা তাঁর হাবীবের বাণী। আল-হাদিস যার নাম।

তবুও পড়তে হয় সেই সব কেতাব। তাঁদের রচিত সেইসব কেতাব– যা আল-কোরআন আর আল-হাদিসের সঠিক বিশ্লেষণে পরিপূর্ণ।

তবুও তালাশ করতে হয় শিক্ষক-ওস্তাদ। না হলে প্রাথমিক শিক্ষার সোপান কি করে অতিক্রম করা যাবে।

সেই সন্ধানে তিনি মাওলানা সাদেক হালওয়ারীর নিকট হাজির হলেন। হজরত মাওলানা তাঁকে সাদরে কবুল করলেন। তিনি তো মোহাম্মদ বাকীকে দেখে রীতিমতো মুগ্ধ। একান্ত আপনজনের মতো তিনি তাঁকে সযত্নে পাঠ দিতে লাগলেন। ক্রমে ক্রমে উজাড় করে দিতে থাকলেন তাঁর সঞ্চিত এলেমের ভাণ্ডার। মোহাম্মদ বাকী পরম শ্রদ্ধাভরে সে সমস্ত অমূল্য এলেম অর্জন করতে লাগলেন। মেধার গুণে অল্পদিনের মধ্যেই তিনি অনেক কিছু হাসিল করলেন। এলেমে বুৎপত্তি অর্জন করলেন।

সবাই তাজ্জব হয়ে দেখলেন তাঁর বৈশিষ্ট্য ও যোগ্যতার কারুকার্য। সমসাময়িক লোক ও সহপাঠিদের মধ্যে নির্ধারিত হলো তাঁর বিশেষ মর্যাদা।

মাওলানা সাদেক হালওয়ারী একবার সফরে যাবেন স্থির করলেন। মাওরা উন্নাহার। অনেক দূরের শহর। সঙ্গে যাবেন মোহাম্মদ বাকী। প্রিয় শাগরিদ বাকী।

মোহাম্মদ বাকী প্রস্তুত হলেন। ওস্তাদের সঙ্গে সফরে যেতে হবে। দূরের অজানা সফর। সঙ্গে ওস্তাদ।

পাথুরে পথ। কখনো বাঁকা। কখনো চড়াই। কখনো উৎরাই। বন্ধুর যাত্রাপথ।

বিচিত্র নিসর্গের সমাবেশ সেই পথে। পৃথিবী কতো বড়, পৃথিবীতে কতো মানুষ আছে কে জানে। কোথায় কোথায় তারা বাস করে। সবখানেইতো সূর্য ওঠে। চন্দ্র ওঠে। আবার যথানিয়মে ডুবে যায়। সবখানেইতো বাতাস বয়। ফুল ফোটে। পাখি গান গায়। শিশু কাঁদে। সবখানেইতো মায়ের স্নেহ ও পিতার শাসন। সবখানেতো হিংসা বিদ্বেষ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা। সবখানেইতো ভালোবাসা। সবখানেইতো সুন্দর আর অসুন্দররের সহাবস্থান। সবখানেইতো আলো-আঁধার, রাত-দিন। তবুও বৈচিত্রের শেষ নেই। সীমা নেই।

মোহাম্মদ বাকী ওস্তাদের সঙ্গে মাওরা উন্নাহার পৌঁছলেন। কেতাবের পাঠ মনে হয় এখানেই শেষ করতে হবে। এবার কেতাবের মালিকের মজলিশে হাজির হতে হবে। কিন্তু কোথায় সে মজলিশ? কে তার খবর জানে?

সেই মজলিশের অন্বেষায় হৃদয়ের প্রবল জোয়ার যে সবকিছু সয়লাব করে দিতে চায়। অন্তরে যে সেই উথাল পাথাল, পাগল করা নেশা।

জাহেরী এলম শিক্ষা তখনও চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেনি। কিন্তু না। আর তো বিলম্ব সয় না। পাঠ শেষ করতে হবে।

মোহাম্মদ বাকী জাহেরী এলেমের শিক্ষা মাঝ পথেই শেষ করলেন। তাঁর হৃদয়ে যে আগুন। কে বুঝবে এ কিসের আগুন। তীব্র এ দহনের শেষ কোথায়? অন্বেষণের আগুন হৃদয়ের গহনে যে তীব্র দহনের জ্বালা সৃষ্টি করেছে।

তামাম মখলুকের এই যে বাহ্যিক রূপ, এই যে বিশাল বৈচিত্রময় সৃষ্টি– তার আড়ালে সেই নিপুণ সৃষ্টিকর্তা কি কেবল অদৃশ্যেই অবস্থান করেন? নাকি তাঁর

সমগ্র সৃষ্টির সাথে তিনি বিরাজমান? তিনি তো তাঁর সৃষ্টিকে ভালোবাসেন, তাঁর বান্দাদের মহব্বত করেন। তাহলে তাঁর সঙ্গে বান্দার মহব্বত স্থাপনের উপায় কি? সেই মহামহিম আল্লাহ্পাকের মহব্বত অন্বেষণে মোহাম্মদ বাকী বেচয়েন হয়ে পড়লেন। সাঙ্গ হলো ধরা বাঁধা এলেম শিক্ষার প্রচেষ্টা। অদৃশ্য সেই স্রষ্টা এবং দ্রষ্টার সঙ্গে মহব্বতের সম্পর্ক স্থাপনের উপায় খুঁজতে অস্থির বাকী– নিজের মাঝে ডুব দিলেন।

সবাই বিস্মিত হলেন। আফসোস করলেন। তাঁর একজন অনুচর বিশিষ্ট একজন আলেমের খেদমতে হাজির হয়ে তাঁর প্রসঙ্গ তুললেন। বললেন, মোহাম্মদ বাকী যে কি করলেন। তিনি যদি আরও কিছুদিন জাহেরী এলেম শিক্ষায় কাটাতে পারতেন, তাহলে দ্বীনী এলেমে পূর্ণতা অর্জন করতে পারতেন।

একথা মোহাম্মদ বাকীর কানে গিয়ে পৌঁছলো। তিনি তখন মুখ খুললেন। বললেন, ধর্মজ্ঞানে পূর্ণতা অর্জন করা তাকেই বলা হয়– যখন যেকোনো কঠিন কেতাব ভালোভাবে বুঝা যায়– হৃদয়ঙ্গম করা যায়। আর সেই সঙ্গে অন্যকেও এর প্রকৃত অর্থ ভালোভাবে বুঝিয়ে দেয়া যায়। ইনশাআল্লাহ্ আমি তা পারবো। যে কোনো কঠিন কেতাবই আমার সামনে আনা হোক না কেনো, তার প্রকৃত অর্থ আমি অন্যকে বুঝিয়ে দিতে পারবো। কোনো প্রকার শর্ত ছাড়াই আমি একথা নিশ্চিতভাবে বলছি।

মাওলানা সাদেক হালওয়ারীর একজন শাগরিদ বর্ণনা করেছেন, আমরা যখন শুনতে পেলাম, মোহাম্মদ বাকী জাহেরী এলেম শিক্ষা ছেড়ে দিয়ে এলমে মারেফত শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছেন, তখন আমরা মন্তব্য করলাম– এ সাহসী বীর দৃঢ়সংকল্পের অধিকারী। যে কাজেই তিনি মনসংযোগ করেন না কেনো, ঈপ্সিত লক্ষ্যে না পৌঁছানো পর্যন্ত কিছুতেই নিবৃত্ত হন না।

তিন

মোহাম্মদ বাকী অলি-আল্লাহ্গণের দরবারে যাতায়াত শুরু করলেন। উদ্দেশ্য, খালেস দিলে আল্লাহ্র সঙ্গে সংযোগ রক্ষাকারীদের খেদমত করা। যেনো তাঁদের মাধ্যমে অসীম আল্লাহ্পাকের মারেফতের রহস্যময় পথের সন্ধান মিলে।

মাওরা উন্নাহারে তখন অনেক অলি-বুজর্গ বাস করেন। এ শহর ছিলো আউলিয়া কেরামের প্রাণকেন্দ্র। মোহাম্মদ বাকী তাঁদের প্রায় প্রত্যেকের নিকট থেকে ফয়েজ হাসিল করতে থাকলেন। কারো কারো কাছে তিনি তওবা করলেন। যেনো নফসের এই নিকৃষ্ট অস্তিত্ব পাপ মুক্ত হয়। না হলে সেই মহাপবিত্র আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য লাভ করা যে সম্ভব হবে না।

কিন্তু কোথাও মন টিকে না। এখানে নয় ওখানে। ওখানে নয় সেখানে। হেথা নয় হোথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনোখানে। কিন্তু কোথায় যাবেন তিনি? মনে হয়, হলো না। কিছুই হলো না। অতৃপ্ত হৃদয় কোথাও স্থিরভাবে বসতে পারে না।

সারা দুনিয়া উন্মুক্ত। অন্য কোথাও যেতে হবে। অন্য কোনোখানে। যেখানে হৃদয়ের সঙ্গে সেই অদৃশ্য বন্ধনে বাঁধা পড়বেন তিনি, সেখানে যেতে হবে।

তিনি প্রথম তওবা করলেন খাজা উবায়েদ র. এর নিকট। খাজা উবায়েদ ছিলেন মাওলানা লুৎফুল্লাহ র. এর খলিফা। মাওলানা লুৎফুল্লাহ ছিলেন খাজেগী দেহিদী র. এর খলিফা।

কিন্তু তওবা মজবুত হলো না। দৃঢ়তার অভাব দেখা দিলো। সমস্ত অন্তর যেমন করে চায়, তেমন হলো না।

আবার সফর শুরু করলেন তিনি। শহর থেকে শহরে। জনপদ থেকে জনপদে।

একসময় সমরখন্দ গেলেন। সেখানে ছিলেন বিখ্যাত বুজর্গ খাজা ইফতেখার র.। মোহাম্মদ বাকী তাঁর খেদমতে হাজির হলেন। অস্থিরতার তরঙ্গ নিয়ে খুব বিনয়ের সঙ্গে তওবার আরজ করলেন। তোলপাড় করছে সমস্ত অস্তিত্ব।

খাজা ইফতেখার প্রথমে সম্মত হলেন না। বললেন, তুমি এখনও যুবক।

কিন্তু মোহাম্মদ বাকী অনড়। তাঁর দৃঢ়তা দেখে শেষে খাজা ইফতেখার রাজী হলেন। বাধ্য হয়ে ফাতেহা পড়লেন। তারপর এরশাদ করলেন, আল্লাহ্‌পাক এস্তেকামাত (দৃঢ়তা) দান করুন।

শেষ পর্যন্ত খাজা ইফতেখারের ধারণাই সত্য হলো। ক্রমে দৃঢ়তা শিথিল হলো। বিশৃঙ্খলা দেখা দিলো ভেতরে বাহিরে।

মোহাম্মদ বাকী তাজ্জব হলেন। কেনো এমন হয় কে জানে। কেনো নিজের সঙ্গে তিনি নিজেই পারেন না? সেই আশ্রয় কোথায় যেখানে অটুটভাবে নিজেকে বেঁধে রাখা যায়। কোথাও দীর্ঘদিন মন বসে না। কিছুদিন একস্থানে অবস্থান করলেই কেমন যেনো এক অস্থিরতা তাঁকে পেয়ে বসে। নেশা লাগে মনে। অদৃশ্য সফরের নেশা। যে নেশা তাঁকে হাতছানি দিয়ে ডাকে।

তিনি এবার বলখের পথে পা বাড়ালেন। সেখানে বিখ্যাত বুজর্গ হজরত আমীর আবদুল্লাহ বলখী র. বাস করেন।

মোহাম্মদ বাকী তাঁর নিকট তওবা করলেন এবং তওবার উপর অটল থাকার চেষ্টা করতে লাগলেন।

হজরত আমীর আবদুল্লাহ এক অনন্য বুজর্গ। তাঁর সোহবত এক বিস্ময়কর নেয়ামত। তাঁর মোবারক সোহবতে কিছুদিন হুদুদে শরীয়ত বা শরীয়তের সীমারেখা রক্ষণের কাজে ব্যয় হলো মোহাম্মদ বাকীর।

আল্লাহ্‌পাক বুঝি তাঁর হৃদয়ের অবস্থা বুঝে রহম করলেন। স্বপ্নে মোলাকাত হলো খাজায়ে বুজর্গ বাহাউল হক ওয়াদ্দীন র. এর সঙ্গে। স্বপ্নেই তাঁর খেদমতে তিনি তওবা করলেন।

এই সময় মোহাম্মদ বাকী ভাবলেন, এবার তরিকত গ্রহণ করার সময় এসেছে।

দরবারের খাদেমগণ বললেন, যে জিকিরের সিলসিলা নবীয়ে করিম সল্লাল্লহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছেছে সেই জিকিরই ফলদায়ক।

মোহাম্মদ বাকী এবার জিকিরে মশগুল হলেন। এভাবে জিকির ও মোরাকাবায় দু'বছর কেটে গেলো।

কিন্তু এ যে অত্যন্ত বন্ধুর পথ। শোনা যায়, সালেককে চল্লিশ বছর যাবত লা ইলাহা– এর ময়দান অতিক্রমণের কাজে কাটাতে হয়। তারপর নজরে আসে ইল্লাল্লহ এর মনজিল। আবার কেউ কেউ দীর্ঘদিন ধরে কেবল জিকিরই করতে থাকেন এবং সেই জিকিরের মধ্যেই তৃপ্ত থাকেন। শুধু শরীয়তের সুরতকেই তাঁরা আঁকড়ে থাকতে চান।

মোহাম্মদ বাকী অন্যান্য অনেক সিলসিলার কথা শুনেছেন। কিন্তু তিনি এই সিলসিলাতেই স্থায়ী থাকবেন বলে সংকল্প করলেন।

এই সিলসিলার বুজর্গগণের অনুগ্রহের ময়দানে 'ফি মা তাস্তাহিল আনফুসু' এর বীজ বপন করা হয়েছে। যার অর্থ– বেহেশতে বেহেশতীদের কাম্য বস্তু থাকবে। ইনশাআল্লাহ্ আশা রাখা যায়, অবশেষে মেহেরবানির হাত ঐ বীজকে 'মারা অহিনুল রায়াত ওয়ালা উজুনুন সামেয়াত' এর জলোচ্ছাস দ্বারা সয়লাব করে দেয়া হবে। মালা অহিনুল রায়াত ওয়াল উজুনুন সামেয়াত-এর অর্থ বেহেশতের নেয়ামত এমন যে, কোনো চোখ তা দেখেনি, কোনো কান তা শোনেনি।

তবুও হলো না। মোহাম্মদ বাকী এবারও স্থির থাকতে পারলেন না। আবার তিনি সফর শুরু করলেন। এবার তিনি এলেন আর এক মুলুক– কাশ্মীরে।

কাশ্মীরে বাস করতেন নকশবন্দিয়া তরিকার বিখ্যাত পীর হজরত মাবায়ে ওয়াশী র.। এই উচ্চ তরিকায়ে নকশবন্দিয়ার অসিলায় আল্লাহ্‌পাকের খাস রহমত বর্ষিত হয়।

হজরত মাবায়ে ওয়াশীও ছিলেন এই তরিকার একজন অনন্যমর্যাদাসম্পন্ন বিখ্যাত অলি। সব সময় তাঁর খানকায় তালেবে মাওলাগণের ভিড় লেগে থাকতো।

মোহাম্মদ বাকী তাঁর সোহবতে থাকবার সৌভাগ্য অর্জন করলেন। হজরতের নেক নজরের ফলে তিনি অনেক বরকত হাসিল করতে সক্ষম হলেন।

কিন্তু সেই নেশা– সেই অস্থিরতা বারবার মোহাম্মদ বাকীকে অস্থির করে তোলে। একসময় তিনি বিখ্যাত বুজর্গ মাওলানা সিপর আলী র. এর খেদমতে হাজির হলেন এবং নিজের হাল সম্পর্কে তাঁর কাছে বর্ণনা করলেন। তিনি মাওলানার অনেক কারামত দেখবার সুযোগ পেলেন এবং ফয়েজ লাভ করার সৌভাগ্য অর্জন করলেন।

তবু সফরের নেশা কাটে না। এক স্থান থেকে আর এক স্থানে তিনি ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। কিন্তু কোথাও মন স্থির হয় না।

একবার বদখশান, একবার লাহোর, একবার মারা উন্নাহার, আরো কতো কতো জায়গা। কিন্তু কোথাও তিনি শান্তি পান না।

পথে প্রবাসে কখনো নির্জনে তিনি বসে থাকেন। কখনো বিখ্যাত আউলিয়া কেরামের লেখা মারেফত সম্বন্ধীয় কেতাব গভীর মনোযোগের সঙ্গে অধ্যয়ন করেন। আবার কখনো যান কোনো আউলিয়ার দরবারে।

এতে করেও সেই মহব্বত লাভের সন্ধানে তিনি অটল। অদৃশ্য ইশকের ডাক তাঁকে উত্তাল, উন্মাতাল করে তোলে। হৃদয়ের আকুল আর্তি কেবল সেই ডাক শোনার জন্য। অন্তরে তাঁর সবসময় তীব্র দহনের জ্বালা। বিরতিহীন, বর্ণনাতীত সেই জ্বালা বুঝি অস্তিত্বহীনতার সমুদ্রে ডুবিয়ে দেবে সবকিছু। এ জ্বালার মতো বুঝি আর কোনো জ্বালা নেই। বিরতীহীন-সীমাহীন বর্ণনাহীন এ দহন।

আমার সঙ্গে আর কার হতে পারে তুলনা,
মোমবাতি? সে তো জ্বলে রাতে শুধু
আমি জ্বলি রাতদিন অন্তহীন বিরামবিহীন---

এ সময়ে তিনি একদিন তাঁর হিন্দুস্তানের এক বন্ধুর নিকট চিঠি লিখলেন। প্রথমেই লিখলেন কবিতা ঃ

মান আয় মুহীত মুহব্বত নেশান হামী দীদাম
কে উস্তুযান-ই আযীযান বে সাহেল উফতাদা আসত।
প্রেমের সমুদ্র হতে নিশানা নিয়েছি আমি তুলে।
প্রিয়জনদের একি হাল! অস্থিগুলি সিন্ধু উপকূলে

হিন্দুস্তান সফর কালে তাঁর এক শুভাকাঙ্খী বন্ধু তাঁকে বললেন 'তুমি সেনাবাহিনীতে চাকুরী নাও। তা'হলে প্রতিপত্তি সম্মান সবকিছু লাভ করতে পারবে।'

কিন্তু মোহাম্মদ বাকী সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। এ সবের জন্য তো তিনি লালায়িত নন। তিনি যে অন্য পথের পথিক।

বন্ধুর প্রচেষ্টা বিফল হলো। তাই হয়। আল্লাহ্পাক যাকে তার আপন পথের পথিক হিসাবে মনোনীত করেন, কার সাধ্য তার দৃষ্টি কেউ অন্য দিকে ফিরিয়ে দেয়।

অন্যের সঙ্গে বন্ধুত্বের বন্ধন ক্রমেই শিথিল হয়ে আসতে লাগলো। একমাত্র আল্লাহ্র প্রেমেই তিনি সারাক্ষণ মাতোয়ারা হয়ে থাকতে লাগলেন।

মোহাম্মদ বাকী ক্রমাগত প্রেমের অন্তহীন মহাসমুদ্রে নিমজ্জিত হতে লাগলেন। নিশ্চিহ্ন হতে লাগলেন।

কে আঁখাল বজুয দানাইঁ দামা নাবুদ
প্রিয়ার মুখের তিলে কিরূপ বাহার্
শিকারীর ফাঁদের যাহা একক আধার।

এ পথে মিলন কোথায়? এ পথে শান্তি কোথায়? এ পথে শেষ কোথায়?

এ পথ পাড়ি দিতে হলে তাঁদেরকেই অনুসরণ করতে হবে, যাঁরা গন্তব্যস্থানে পৌঁছতে পেরেছেন। এ পথ যাদের চেনা। সেই আউলিয়া কেরামের পথে। তাঁদের লেখা এলমে মারেফতের কেতাব তাই মোহাম্মদ বাকীর একমাত্র পার্থিব সাথী হয়েছে। তাঁদের খেদমত করা তাই তাঁর একমাত্র কর্তব্য হয়েছে।

মজজুবগণের প্রতিও তাঁর অগাধ ভক্তি। যেখানেই তিনি মজজুব পান সেখানেই তিনি তাঁদের খেদমতে হাজির হন। তাঁদের মহামূল্যবান সোহবত থেকে পূর্ণ ফায়দা হাসিলের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন।

একবার তিনি লাহোর এলেন। এসেই লেগে গেলেন অলি মজজুবগণের তত্ত্ব তালাশে। সে জন্য কোনো কষ্টই যেনো কষ্ট নয় তাঁর কাছে। প্রেমের পথে যতো বাধাই আসুক সব কিছু দলে যেতে পারেন তিনি। আল্লাহ্পাক তাঁর কদমে সেই জোর দিয়েছেন।

লাহোরের বনে বনানীতে, পথে ঘাটে, কবরস্থানে তিনি উদভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়াতে থাকেন। কোনো ক্লান্তি নেই। শ্রান্তি নেই। দুর্দম ঝোঁকে আচ্ছন্ন অন্তর। দুর্দমনীয় অস্থিরতার যেনো কোনো বিরাম নেই। মোহাম্মদ বাকী ছুটাছুটি করেন পথে প্রান্তরে, গভীর অরণ্যে কিংবা কোনো বিরান কবরস্থানে।

একবার একজন তাঁর সহচর হবার জন্য আবেদন জানালেন। তিনি নিষেধ করলেন। কিন্তু সে ব্যক্তিও নাছোড়বান্দা। কিছুক্ষণ সে মোহাম্মদ বাকীর সঙ্গে ঘোরাফিরা করলো। তারপর ক্লান্ত হয়ে পড়লো। কিন্তু মোহাম্মদ বাকী নির্বিকার।

তাঁর চলার বিরাম নেই। কোনো ক্লান্তি নেই, শ্রান্তি নেই। লোকটি আদব ও শরমের কারণে মোহাম্মদ বাকীকে কিছু বলার সাহস পাচ্ছিলো না। তিনি তাকে ফিরে যাবার ইঙ্গিত করলেন। সে বললো, হজরতের কদম কী রকম। আর তিনিই বা কী রকম। তাঁর সমস্ত কিছুর মধ্যেই যে গায়েবী মদদ আছে। অন্য কেউ তাঁর সঙ্গে পারবে কেমন করে?

কিত্ এ ইঁ বাহজুয পায়ে জুনুন নতুযা করদ।

যদি না থাকে কারো প্রেমের কদম
কিভাবে করবে সে এই পথ অতিক্রম।

মোহাম্মদ বাকী একদিন জানতে পারলেন, লাহোরের এক কবরস্থানে একজন মজজুব থাকেন। তিনি সেই মজজুবের খেদমতে গিয়ে হাজির হলেন।

মজজুব তাঁকে দেখেই গালাগালি শুরু করলেন। কিন্তু যতো গালাগালিই তিনি করেন না কেনো মোহাম্মদ বাকী তাঁর পিছু ছাড়েন না। তখন থেকে প্রায় সময়ই তিনি তাঁর খেদমতে হাজির হতে লাগলেন। কিন্তু মজজুবের মন কিছুতেই নরম হয় না। মোহাম্মদ বাকীও নির্বিকার। তাঁর আগ্রহ বিন্দুমাত্রও কমে না।

মজজুব কখনো কখনো মোহাম্মদ বাকীকে দূর থেকে দেখলে পাশ কাটিয়ে চলে যান। কখনো কটুবাক্যে তাঁকে জর্জরিত করেন।

সঙ্গহা দিদ ও দিল আয শিশা মিরবী না তাফত্
পাথর পড়েছে কতো শরীরের পরে
তবুও হাজির আমি প্রিয়ার আসরে।

এভাবেই কিছুদিন কেটে গেলো। সহসা একদিন মজজুব তাঁর প্রতি মনোযোগী হলেন। স্নেহমাখা ইঙ্গিতে তাঁকে কাছে ডাকলেন। তারপর প্রাণভরে তাঁর মকছুদ পূরণের জন্য আল্লাহ্পাকের দরবারে দোয়া করলেন। সঙ্গে সঙ্গেই দোয়ার প্রতিক্রিয়া জারী হলো। মোহাম্মদ বাকী কামিয়াব হলেন। মজজুবের দোয়ায় যেনো তাঁর রূহানী উন্নতির দরজা খুলে যাচ্ছে। সফলতার আনন্দে তাঁর বুক ভরে উঠলো।

চার

সময় যদি এভাবেই যেতো তবে কতোই না ভালো হতো। কিন্তু মন এ রকম কেনো। এতো যন্ত্রণা কেনো। বিষাদের ব্যথা কেনো। কোনো কিছুতেই যেনো স্থায়ীত্ব নেই। তৃপ্তি নেই। শান্তি নেই।

এ পথ যে এরকমই। যার শুরু আছে, শেষ নেই। অসীম অনন্তের পথে যে এই যাত্রা। কোথায় সীমানা। কোথায় গন্তব্য।

মহান সৃষ্টিকর্তা মোহাম্মদ বাকীকে এভাবেই সৃষ্টি করেছেন। তৃপ্তি কিভাবে আসবে। যে তৃপ্ত সে সেতো বঞ্চিত। বিরহীর অতৃপ্তিই তো পরম প্রাপ্তি।

হৃদয়ের ব্যাকুলতা নিয়ে মোহাম্মদ বাকী আবার সফর শুরু করলেন।

কিছুদিন ঘরে থাকেন। আবার কিছুদিন সফরে। কিন্তু প্রতীক্ষার যেনো কোনো শেষ নেই। সমস্ত দেহমন সমগ্র অস্তিত্ব যেনো তৃষ্ণার্ত হয়ে চেয়ে থাকে এক অন্তহীন অপার্থিব আলোকবারীর পানে।

সফরে থাকাকালীন সময়ে তিনি স্থির করলেন, সিলসিলার কোনো শ্রেষ্ঠ বুজর্গের খেদমতে হাজির হয়ে নতুন করে তরিকার সবক গ্রহণ করবেন। সেই এরাদায় এস্তেখারা করলেন। দেখতে পেলেন, নকশবন্দিয়া সিলসিলার বিখ্যাত বুজর্গ হজরত খাজা মোহাম্মদ পারসা রহ. রূহানীভাবে তাঁর কাছে হাজির হয়েছেন। আর তাঁর মোবারক মুখ থেকে নিঃসৃত হচ্ছে এই বাণীঃ সুলুক বা তাফাজ্জল-এর সারকথা হচ্ছে চরিত্র সংশোধন। সেই লক্ষ্যে কামিয়াব হবার পর অন্যান্য প্রয়োজন আর তেমন অবশিষ্ট থাকে না।

গভীর অস্থিরতা ও পেরেশানির কারণে মোহাম্মদ বাকী ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে পড়ছিলেন। তখন যৌবনকাল। তবু যৌবনের উচ্ছলতা নেই। অন্বেষণের আর্তি অহরহ অন্তরকে ক্ষতবিক্ষত করে। আল্লাহ-অন্বেষণের কি বিরাট যন্ত্রণা। সেই অদৃশ্য যন্ত্রণায় প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়। বিনা আগুনে বুকের ভিতর জ্বলতে থাকে। তবু সে অন্বেষণের শেষ নেই। অন্বেষণ চলতে থাকে অন্তরের অন্তহীন তাগিদে।

মোহাম্মদ বাকীর মায়ের বিস্ময়ের অবধি থাকে না। জোয়ান ছেলে, কেমন হয়ে গিয়েছে। যেনো পাহাড় পাহাড় ব্যথা তার বুকে চেপে থাকে সারাক্ষণ। কি আশ্চর্য সন্তান তাঁকে দিয়েছেন আল্লাহ্পাক। এক আল্লাহ্ ছাড়া কোনো চিন্তাই তার

মনে স্থান পায় না। সারাক্ষণ বিষণ্ন বিবর্ণ। মার মন অস্থির হয়ে ওঠে। ছেলের কষ্ট দেখে তাঁর বুক কেঁপে ওঠে। কিন্তু আল্লাহ্পাকের দরবারে কায়মনবাক্যে ছেলের মঙ্গলের জন্য মোনাজাত করতে থাকেন।

সেহেরীর সময় অথবা গভীর রাতে প্রায়ই তিনি আল্লাহ্পাকের মহান দরবারের দিকে তুলে ধরেন তাঁর দুই হাত। মায়ের সে পবিত্র হাত যেনো আল্লাহ্পাকের আরশ স্পর্শ করে। মা দোয়া করেন, 'হে মেহেরবান প্রভু আমার প্রাণপ্রিয় সন্তান তোমার জন্য সবকিছু ত্যাগ করেছে। জীবন যৌবনের ভোগ লালসার প্রতি তার বিন্দুমাত্র বাসনা নেই। তার সকল কামনা, সকল বাসনা শুধু কাঙ্গালের মতো তোমাকে ঘিরে। তার প্রতি তুমি সদয় হও। মেহেরবান, তাকে কবুল করো। তার বাসনাকে সফল করো তুমি। নয়তো আমাকেই এ দুনিয়া থেকে তুলে নাও। প্রিয়তম সন্তানের এই বিষাদক্লিষ্ট মলিন বদন দেখার মতো শক্তি যে আর আমার নেই।

সন্তানের জন্য মায়ের দোয়া। কবুল না হয়ে কি পারে। এ দোয়া যে আরশ কাঁপিয়ে দেয়।

মোহাম্মদ বাকী বলতেন, অন্য অলিদের মতো আমি কঠোর সাধনা করিনি। কিন্তু আল্লাহ্পাকের মারেফতের রহস্য উন্মোচনের জন্য আমার মধ্যে ছিলো দুর্বার অস্থিরতা। আশা নিরাশা ও প্রতীক্ষার যন্ত্রণা সব সময় আমাকে ব্যাকুল করে রাখতো। দিনের পর দিন পেরেশানীর অসহনীয় যন্ত্রণা আমাকে সহ্য করতে হয়েছে। আল্লাহ্প্রাপ্তির পথে সেই সহ্যশক্তি, সেই সবর আমাকে কামিয়াব করেছে। সেই সঙ্গে ছিলো স্নেহময়ী মায়ের হৃদয় উজাড় করা দোয়া। তাঁর দোয়ায় আমার পথ প্রশস্ত হয়েছে। অবশেষে আমার মকছুদ পূর্ণ হয়েছে।

একদিন মোহাম্মদ বাকী গভীর মনোযোগ সহকারে মারেফতের একটি কেতাব পড়ছিলেন। সহসা তাঁর মধ্যে এক বিশেষ অবস্থার সৃষ্টি হলো। তিনি আত্মবিস্মৃত হয়ে পড়লেন। দেখলেন, হজরত খাজা বাহাউদ্দিন নকশবন্দ র. তাঁর রূহানী জজবা দ্বারা তাঁকে আকর্ষণ করছেন। সেই অবস্থাতেই রূহানীভাবে হজরত নকশবন্দ র. এর কাছ থেকে তিনি জিকিরের তালিম পেলেন। তখন এক বিস্ময়কর হাল তাঁর ভিতরে প্রকাশ পেলো। বিশেষ এক হুজুরী তাঁকে আচ্ছন্ন করে ফেললো।

এরপর থেকেই তিনি মহামর্যাদাসম্পন্ন নকশবন্দিয়া সিলসিলার বুজর্গগণের রূহানী মোলাকাত ও বাতেনী ফায়দা লাভ করতে লাগলেন। বুজর্গগণের জামাত রূহানীভাবেই তাঁকে বিভিন্ন বিষয়ে তালকীন করতেন। এর ফলে তিনি ওয়ায়সী র. নিয়মে ফয়েজ আহরণ করতে শুরু করলেন। অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর বাতেনী অবস্থা নূরে ভরপুর হয়ে গেলো। তিনি পূর্ণতার প্রান্তে এসে উপনীত হলেন।

কিন্তু যে জগতের যে নিয়ম তাই মেনে চলতে হয়। দুনিয়ায় বেঁচে থাকতে জীবন্ত পীরের খেদমতেই উপস্থিত হতে হয়। কামেল জাহেরী পীর ছাড়া উপায় নেই।

মোহাম্মদ বাকী এক রাতে স্বপ্ন দেখলেনঃ নকশবন্দিয়া সিলসিলার মহান বুজর্গ হজরত খাজা ওবায়দুল্লাহ র. তশরীফ এনেছেন। কি নূরানী চেহারা মোবারক তাঁর। চোখ ফেরানো যায় না। তিনি গম্ভীর স্বরে নির্দেশ দিলেন 'তুমি হজরত খাজেগী আমকাংগীর নিকট যাও। তোমার মকছুদ ইনশাল্লাহ্ পূর্ণ হবে।'

পাঁচ

আল্লাহতায়ালার খাস রহমতের ধারায় পরিপূর্ণতার প্রতীক হজরত খাজা ওবায়দুল্লাহ আহরার রহ.। নকশবন্দিয়া সিলসিলার এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। তিনি শুধু পীর ছিলেন না। তিনি ছিলেন পীরের পীর। মোর্শেদেরও মোর্শেদ ছিলেন তিনি। ছিলেন জামানার আলোকবর্তিকা, পথের কাণ্ডারী।

তিনি বলতেন, আমি যদি শুধুমাত্র পীরের দায়িত্ব পালন করি, তাহলে অন্যকোনো পীর আর মুরিদ পাবেন না। কিন্তু আমার উপর অন্য ধরনের বিরাট দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। মুসলমানকে জালেমদের হাত থেকে রক্ষা করা, শরীয়তের আইন কানুন যথাযথভাবে প্রচলন করা এবং একই সঙ্গে বাদশাহ্দের যথেচ্ছাচারিতা ও খেলাফ কাজসমূহের বিরুদ্ধাচরণ করাই হচ্ছে আমার প্রধান কাজ। আল্লাহ্পাক আমাকে এমন ক্ষমতা দিয়েছেন যে, যদি আমি খাতা'র বাদশাহ্কেও পত্র দিয়ে জানাই– তুমি সিংহাসন ত্যাগ করে খালি মাথায় খালি পায়ে আমার খানকায় হাজির হও, তাহলে সেও আমার হুকুম মানতে বাধ্য হবে। কিন্তু আমি আল্লাহ্তায়ালার ইশারা ছাড়া কোনো কাজ করি না। তরিকতের আদব সেই শিখেছে, যে নিজের ইচ্ছাকে আল্লাহ্পাকের ইচ্ছার অনুগামী করতে পেরেছে।

পবিত্র স্থান বাগস্তান। বাগস্তান তাসখন্দ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। এই বাগস্তানেই জন্ম নিয়েছিলেন হজরত খাজা ওবায়দুল্লাহ আহরার র.। তখন ছিলো রমজান মাস। আটশ' হিজরী।

জন্মের পর থেকে চল্লিশ দিন পর্যন্ত তিনি মায়ের স্তনে মুখ দেননি। চল্লিশ দিন পর যখন তার মা নেফাস অবস্থা থেকে পবিত্র হলেন, তখন থেকে তিনি মায়ের দুধ খাওয়া শুরু করেছিলেন।

হজরতের দাদা ছিলেন তৎকালীন জামানার কুতুব, বিখ্যাত বুজর্গ হজরত খাজা শাহাবুদ্দিন র.। তিনি তার নাতি খাজা ওবায়দুল্লাহ আহরার র. এর শিশুকালেই তার সম্পর্কে বলেছিলেন, 'এই ফরজন্দ সম্পর্কে আমাকে সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। ইনি পীরে আলমগীর (সারা দুনিয়ার পীর) হবেন। তাঁর শরীয়ত ও তরিকত অত্যন্ত রওনক হবে।

খাজা ওবায়দুল্লাহ আহরার র. এর পীর ছিলেন হজরত খাজা বাহাউদ্দিন নকশবন্দ র. এর বিখ্যাত মুরিদ ও খলিফা হজরত মাওলানা ইয়াকুব চরখী র.। তিনি পরে হজরত নকশবন্দ র. এর প্রধান খলিফা হজরত আলাউদ্দিন আত্তার র. এর নিকট থেকে তরিকার পূর্ণ কামালাত ও খেলাফত লাভ করেন।

হজরত মাওলানা ইয়াকুব চরখী র. খাজা আহরার র.কে বায়াত করবার পর পরই খেলাফত প্রদান করেন। এতে তাঁর কোনো কোনো মুরিদ ঈর্ষান্বিত হয়ে ওঠেন। তখন হজরত চরখী র. তাঁদের মনের অবস্থা জানতে পেরে বলেন, 'খাজা ওবায়দুল্লাহ আহরার বহু পূর্বেই রূহানী ক্ষমতা অর্জন করেছিলেন। তাঁর খেলাফত ও এজাজত প্রাপ্তিই কেবল বাকী ছিলো। মুরিদগণের উচিত, তাঁরা যেনো ওবায়দুল্লাহর মতো হৃদয় নিয়ে পীরের দরবারে হাজির হন। কারণ তিনি তেল ভর্তি চেরাগ নিয়ে এসেছিলেন। আমি শুধু তা জ্বালিয়ে দিয়েছি।

হজরত মাওলানা চরখী র. খাজা আহরারকে একটি ঘটনা বর্ণনা করে শোনান। প্রত্যেক মুরিদেরই এই ঘটনা স্মরণ রাখা প্রয়োজন।

হজরত কুতুবউদ্দিন হায়দর র. এর এক মুরিদ ছিলেন। একবার তিনি ক্ষুধার্ত অবস্থায় হজরত শায়েখ শেহাবুদ্দিন সোহরাওয়ার্দী রা. এর খানকায় হাজির হলেন। কিন্তু তিনি কাউকে কিছু না বলে শুধু তাঁর পীরের গ্রামের দিকে মুখ করে বলতে লাগলেন, হে কুতুবুদ্দিন হায়দর। আমি ক্ষুধার্ত। আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে আমার খাবারের বন্দোবস্ত করুন।

হজরত শায়েখ শেহাবুদ্দিন র. জলদি করে তাঁর সামনে খানা হাজির করবার নির্দেশ দিলেন। খানা সামনে হাজির করা হলে উক্ত মুরিদ খানা খেলেন। তারপর আবার তাঁর পীরের গ্রামের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, হে কুতুবুদ্দিন হায়দর। আমি আল্লাহ্‌পাকের শোকর করছি। আপনি আমাকে কোনো সময়ের জন্য ভুলেননি।

খানকার একজন খাদেম ঘটনা দেখে বিস্মিত হলেন। তিনি এই ঘটনা হজরত শেহাবুদ্দিন সোহরাওয়ার্দীর নিকট বর্ণনা করলেন। বললেন, 'কি আজব দরবেশ।

আপনার দরবারে খানা খেয়ে হজরত কুতুবুদ্দিন হায়দরের শোকরানা আদায় করছে।'

হজরত সোহরাওয়ার্দী জবাব দিলেন, 'মুরিদ হবার নিয়ম কানুন তাঁর কাছ থেকে সবারই শিক্ষা করা প্রয়োজন। প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্য যে কোনো ফায়দা যে কোনো স্থান থেকে হাসিল হোক না কেনো, সমস্তই নিজের পীরের বরকতে হাসিল হয়েছে– মুরিদকে তাই মনে করতে হবে।'

হজরত খাজা ওবায়দুল্লাহ আহরার র. বলতেন, 'যার দিল দুনিয়ার আকর্ষণ থেকে মুক্ত এবং আল্লাহ্‌র জিকিরে মত্ত– তাঁর জীবনই সবচেয়ে সুন্দর এবং তিনিই সবচেয়ে বেশী সৌভাগ্যবান।'

তিনি বলতেন, 'যিনি হজরত নবীয়ে করিম সল্লাল্লহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের মর্জির মধ্যে নিজ সত্তাকে বিলীন করতে পেরেছেন, যিনি নবীজির সুন্নত অনুযায়ী আমল করতে পারেন এবং যার চালচলন স্বভাবচরিত্র নবীজির মতো সুন্দর ও মহান, পবিত্র ও মঙ্গলময়, তিনিই পীর হবার যোগ্যতা রাখেন।'

একবার খাজা আহরারের প্রতি এলহাম হলো, 'শরীয়তের শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে হবে। মিল্লাতকে সংগঠিত করতে হবে।'

তিনি সঙ্গে সঙ্গে সমরখন্দ রওয়ানা হয়ে গেলেন। মীর্জা আবদুল্লাহ ছিলেন তখন সেখানকার গভর্ণর।

মীর্জা আবদুল্লাহর একজন আমীর হজরতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন। হজরত তাঁকে বললেন, আমি আপনাদের মীর্জার সঙ্গে মোলাকাত করতে এসেছি। যদি আপনি তাঁর সঙ্গে আমার মোলাকাত করিয়ে দিতে পারেন, তবে আপনি আল্লাহ্‌পাকের মকবুল বান্দাগণের দলভুক্ত হবেন।

আমীর বেয়াদবীর সঙ্গে জবাব দিলেন, 'আমাদের মীর্জা একজন বেপরোয়া নওজোয়ান। তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন। তাঁর সাক্ষাৎ পাওয়া কঠিন। আর তাছাড়া তাঁর সঙ্গে দরবেশ ব্যক্তিদের মোলাকাতের প্রয়োজনই বা কি।

হজরত জবাব দিলেন, 'আমাকে সুলতানদের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য আদেশ দেয়া হয়েছে। নিজের ইচ্ছায় আমি এখানে আসিনি। যদি আপনার মীর্জা পরোয়া না করেন, তবে তাঁকে বরখাস্ত করা হবে। আর তাঁর আসনে বসানো হবে এমন ব্যক্তিকে যিনি আল্লাহ্‌পাকের বান্দাগণের পরোয়া করেন।'

আমীর চলে যাবার পর হজরত খাজা আহরার দেয়ালে মীর্জা আবদুল্লাহর নাম লিখলেন। তারপর থুথু দিয়ে সেই নাম মুছে ফেলে বললেন, 'এই বাদশাহ এবং আমীর দ্বারা কোনো কাজ হবে না। কাজেই তাদের কোনো প্রয়োজন নেই।'

হজরত সেই দিনই তাসখন্দে ফিরে গেলেন। তার এক সপ্তাহ পরে ঐ আমীর মারা গেলেন। আর একমাস পরে তুর্কীস্তানের সুলতান আবু সাইদ, মীর্জা আবদুল্লাহর রাজ্য আক্রমণ করলেন এবং তাঁকে হত্যা করলেন।

একবার হজরত আহরার র. অনেক সাথীসহ কোনো স্থানে যাচ্ছিলেন। বেলা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। দূরের পথ, বিপদ আপদে ঘেরা। সাথীরা ভয় পেয়ে গেলেন। হজরত অভয় দিলেন, তোমরা চিন্তা কোরোনা। আল্লাহ্‌পাকের রহমতে সূর্য ডুবার আগেই আমরা গন্তব্যস্থানে পৌঁছে যাবো।

হজরতের পবিত্র জবান থেকে যা বের হয়েছিলো শেষে তাই ঘটলো। সবাই গন্তব্য স্থানে না পৌঁছানো পর্যন্ত সূর্য স্থির হয়ে রইলো। তাঁরা শহরে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গেই সূর্য অস্তমিত হলো। সূর্য ডোবার পর পশ্চিমাকাশে অনেকক্ষণ ধরে যে লাল রঙ দেখা যায় তাও দেখা গেলো না।

সবাই আশ্চর্য হলেন। তাঁরা প্রশ্ন করলেন, এ কি করে সম্ভব?

হজরত খাজা ওবায়দুল্লাহ আহরার র. জবাবে শুধু বললেন, তরিকতের গভীর জ্ঞান এবং অতুলনীয় নৈপুণ্যের তুলনায় এসব খেলাধূলা মাত্র। এতে বিস্মিত হবার কিছু নেই।

একবার অনেক দূর থেকে দু'জন দরবেশ হজরত খাজা আহরার র. এর জেয়ারতের উদ্দেশ্যে তাঁর খানকায় এসে হাজির হলেন। খানকায় পৌঁছেই তাঁরা শুনলেন, হজরত বাদশাহ্‌র দরবারে গিয়েছেন। একথা শুনেই তারা ভাবতে লাগলেন, এ কেমন দরবেশ। বাদশাহর নিকট ফকিরের কি প্রয়োজন থাকতে পারে। হাদিস শরীফে বলা হয়েছে, আমীর ও বাদশাহ্‌র দরবারে গমনকারী ফকির অত্যন্ত নিকৃষ্ট। হজরত আহরারের উপরে তো এই হাদিসই প্রযোজ্য হয়। একথা বলেই তাঁরা ফিরে চললেন।

ঘটনাক্রমে ঐ সময় দু'জন চোর বাদশাহ্‌র দরবার থেকে পালিয়ে গিয়েছিলো। চোর-অনুসন্ধানে নিয়োজিত পুলিশ দরবেশ দু'জনকে চোর মনে করে বাদশাহ্‌র দরবারে হাজির করলো।

বাদশাহ বললেন, শরীয়তের আইন অনুযায়ী তাদের হাত কেটে দেয়া হোক।

সে সময় হজরত খাজা ওবায়দুল্লাহ আহরার র. দরবারে বসেছিলেন। তিনি বললেন, 'ওরা চোর নন। ওরা আমার সঙ্গে মোলাকাতের জন্য এসেছিলেন।' তারপর তাদেরকে নিজের খানকায় নিয়ে এসে তিনি বললেন, আমি আপনাদের হাত কাটা থেকে বাঁচাবার জন্যই বাদশাহর দরবারে গিয়েছিলাম। বাদশাহ্‌র দরবারে যাতায়াতকারী ফকির যে নিকৃষ্ট, তা ঐ সমস্ত ফকিরদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, যারা দুনিয়া লাভের উদ্দেশ্যে বাদশাহ্‌র কাছে যায়।

রবিউল আউয়াল মাসের ঊনত্রিশ তারিখ। হিজরী আটশত পঁচানব্বই।

হজরত খাজা ওবায়দুল্লাহ আহরার র. রফিকে আলার দরবার থেকে ডাক শুনতে পেলেন।

আর তো দেরী কারবার উপায় নেই। এবার ফিরে যেতে হবে। মূল মনজিলে ফিরে যেতে হবে এবার। তিনি প্রস্তুত হলেন।

শিয়রের পাশে অনেক মোমবাতি জ্বলছিলো। হঠাৎ তাঁর দুই কপালের মাঝখান থেকে এক অপরূপ নূর প্রকাশিত হলো। মোমবাতির আলো ম্লান হয়ে গেলো সেই নূরের আলোতে।

তারপর মাত্র কয়েক মুহূর্তের মধ্যে তিনি চলে গেলেন। দুনিয়া থেকে চিরদিনের জন্য বিদায় নিয়ে গেলেন।

সমরখন্দে তার মাজার মোবারক এখনো তাঁর পবিত্র স্মৃতি বুকে করে ধরে রেখেছে।

ছয়

মোহাম্মদ বাকী পুনরায় স্বপ্ন দেখলেন। তিনি দেখলেন– হজরত খাজেগী আমকাংগী র. স্বয়ং হাজির হয়েছেন। তিনি আবেগজড়িত কণ্ঠে বলছেন, হে ফরজন্দ! তোমার জন্য আমার হৃদয় ব্যথিত। দুই চোখ দীর্ঘ প্রতীক্ষায় ব্যাকুল।

স্বপ্ন ভেঙে গেলো। মোহাম্মদ বাকীর হৃদয়ে তখন আনন্দের তরঙ্গ আকুলি বিকুলি করছে। এবার আশ্রয় মিলেছে। দীর্ঘ বন্ধুর মরুপথ অতিক্রম শেষে এবার দেখা মিলেছে সেই নয়ন জুড়ানো শ্যামল মরুদ্যানের। সেখানে প্রাণ আছে– প্রাণের স্থায়ী ঠিকানা আছে। তিনি মনে মনে আবৃত্তি করলেন-

বহু দিন স্রোতহীন এ মরা নহর,
সহসা নসীব হলো প্রেমের নজর।

এবার তিনি পা বাড়ালেন মাওরা উন্নাহারের দিকে। অনেক দূরের পথ। অনেক প্রান্তর পাহাড় জনপদ আবার পাড়ি দিতে হবে। পৌঁছতে হবে মোর্শেদের দরবারে।

নিসর্গের বুক চিরে পথ। নীল আসমানের নিচে চড়াই উৎরাই পেরিয়ে আবার তিনি পথ চলা শুরু করলেন। মন উচাটন। চোখে নেশা। যে নেশায় সৃষ্টির আনন্দ সুখ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। যে নেশা ধ্বংস করে দেয় সকল উদভ্রান্তি, অস্থিরতা। যে

নেশায় মৌমাছি পাগল হয়ে আসে সেই ঘ্রাণ ছড়ানো প্রিয়তমা ফুলের রেণু বনে। ফুলের ডাকে তার কোমল বুকে।

সময় আগত প্রায়। বুকে বুক রাখার সময়। কলিজায় কলিজা রেখে পরস্পরের আল্লাহ্ প্রেমের উত্তাপে মগ্ন হবার সময়। মোর্শেদের হৃদয়ের অভ্যন্তরে আল্লাহ্ প্রেমের যে নিখুঁত নকশা গোপনে আঁকা আছে, তারই অনুলিপি মুরিদের বুকে এঁকে নেবার সময়।

মাঅরা উন্নাহারে তিনি বাস করেন। নকশবন্দিয়া তরিকার সেই জান্নাতি সেতারা হজরত খাজেগী আমকাংগী র.।

মোহাম্মদ বাকী প্রবল উৎসাহে পথ চলতে শুরু করলেন।

সাত

হজরত মাওলানা খাজেগী আমকাংগী র.।

তিনি ছিলেন তার পিতা ও পীর হজরত খাজা দরবেশ মোহাম্মদ র. এর গদ্দিনশীন। দীর্ঘ তিরিশ বছর ধরে তিনি তালেবে মাওলাগণের তরবিয়ত করেছিলেন। তাদেরকে মকছুদ মনজিলে পৌঁছতে সাহায্য করেছিলেন।

তিনি নকশবন্দিয়া তরিকার আদবের প্রতি অত্যন্ত সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন এবং উচ্চস্বরে জিকির থেকে সব সময় বিরত থাকতেন। কারণ উচ্চস্বরে জিকির করা নকশবন্দিয়া তরিকাবিরোধী কাজ।

তাঁর আদব ও আখলাক ছিলো অতুলনীয়। তাঁর কলবের নূর ছিলো সূর্যরশ্মির চেয়েও বেশী আলোকোজ্জ্বল। নিজের জামানার তালেবে মাওলাগণকে তিনি একাই আশ্রয় দিয়েছেন। পথের দিশারী বলতে তালেবে মাওলাগণ তাঁকেই বুঝতেন।

আমির ফকির সবাই তাঁর দরবারে হাজির হতেন। বাদশাহ্ ও সুলতানগণ তাঁর দরবারের ধূলিকে মনে করতেন পবিত্র সুরমার মতো।

একবার সমরখন্দ আক্রান্ত হলো। আক্রমণ করেছিলেন পীর মোহাম্মদ খান নামে একজন বাদশাহ্। তাঁর সঙ্গে ছিলো পঞ্চাশ হাজার অশ্বারোহী সৈন্যের এক বিশাল সেনাবাহিনী।

সমরখন্দের আমির বাকী মোহাম্মদ খান ভয়ানক ঘাবড়ে গেলেন। এই বিশাল বাহিনীকে তিনি কীভাবে প্রতিহত করবেন। তাঁর অল্প সংখ্যক সৈন্য নিয়ে কীভাবে এই বিরাট সেনাদলের মোকাবেলা করবেন, এই চিন্তায় তিনি অস্থির হয়ে উঠলেন।

উপায়ন্তর না দেখে আমির বাকী মোহাম্মদ খান হজরত খাজেগী আমকাংগী র. এর দরবারে হাজির হয়ে তাঁর আর্জি পেশ করলেন।

হজরত আমকাংগী র. তখন নিজেই বাদশাহ্ পীর মোহাম্মদ খানের শিবিরে হাজির হলেন। তাকে বললেন, মুসলমান মুসলমানে যুদ্ধ হওয়া অনুচিত। আপনি ফিরে যান।'

বাদশাহ্ হজরতের কথা কানে নিলেন না।

অগত্যা হজরত আমকাংগী র. ফিরে এলেন। তিনি আমির বাকী মোহাম্মদ খানকে বললেন, 'আপনি চিন্তিত হবেন না। অল্প সংখ্যক সৈন্য নিয়েই আপনি দুশমনদের মোকাবেলা করুন। ইনশাআল্লাহ্ আপনিই জয় লাভ করবেন।

হজরতের হুকুম মোতাবেক অল্পসংখ্যক সৈন্য নিয়েই আমির বাকী মোহাম্মদ খান যুদ্ধের ময়দানে হাজির হলেন।

হজরত আমকাংগী র.ও তাঁদের পিছনে চললেন। যুদ্ধের ময়দানের নিকটে একটি পুরাতন মসজিদ ছিলো। তিনি কিছু সংখ্যক দরবেশসহ সেই মসজিদে মোরাকাবায় নিমগ্ন হলেন।

অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই একজন দূত এসে হজরতকে সংবাদ দিলো, আমির বাকী মোহাম্মদ খান জয়লাভ করেছেন।

সংবাদ শোনার পর হজরত দরবেশদের নিয়ে আবার নিজের খানকায় ফিরে এলেন।

তুরানের আমির একবার খাবে দেখলেন, এক আজিমুশমান মজলিশ বসেছে। সেখানে সভাপতিত্ব করছেন স্বয়ং হজরত রসুলেপাক সল্লাল্লহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম।

দরজায় দাঁড়ানো একজন দ্বাররক্ষী। হাতে তাঁর লাঠি। তিনি মানুষের বিভিন্ন ফরিয়াদ শুনছেন আর তা পেশ করছেন নবীজির খেদমতে। নবীজির জবাব আবার জানিয়ে দিচ্ছেন প্রতীক্ষমাণ মানুষদেরকে।

আমির আবদুল্লাহ খান দেখলেন, হজরত রসুলুল্লাহ স. ঐ দ্বাররক্ষীর হাতে একটি তলোয়ার দিলেন তাঁকে দিবার জন্য। দ্বাররক্ষী ঐ তলোয়ার তাঁর নিজ হাতে আমির আবদুল্লাহ খানের কোমরে বেঁধে দিলেন।

স্বপ্ন শেষ হলো। পরদিন তিনি তাঁর দরবারের সবার নিকট ঐ দ্বাররক্ষীর চেহারা বর্ণনা করে বললেন, এইরূপ চেহারার কাউকে আপনারা চেনেন কি?

তখন সকলেই একবাক্যে বললেন, এইরূপ চেহারার ব্যক্তি হজরত খাজেগী র. ছাড়া আর কেউই নন।'

সবার মুখে একই কথা শুনে আমীর আবদুল্লাহ অত্যন্ত আগ্রহ উদ্দীপনার সঙ্গে তখনি হজরত আমকাংগী র. এর মোলাকাত লাভের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন।

হজরতের দরবারে পৌঁছে তিনি আশ্চর্য হলেন। এইতো সেই নূরানী ব্যক্তি– সেই দ্বাররক্ষী, যিনি তাঁর কোমরে তলোয়ার বেঁধে দিয়েছিলেন।

আমীর সাহেব অত্যন্ত আদব ও বিনয়ের সঙ্গে হজরতের খেদমতে হাদিয়া পেশ করে তা কবুল করবার আরজি জানালেন এবং দোয়ার দরখাস্ত পেশ করলেন।

হজরত হাদিয়া গ্রহণ করতে রাজী হলেন না। বললেন, 'মনের বাসনা পূর্ণ না হওয়া, কানায়াত এবং অল্পে তুষ্টির নামই ফকিরি।'

আমির সাহেব তখন কোরআন শরীফের আয়াত তেলাওয়াত করে শোনালেন- 'আতিউল্লাহা ওয়া আতিউর রসুলা ওয়া উলিল আমরি মিনকুম' (আল্লাহ্‌র তাবেদারী করো, তাঁর রসুলের তাবেদারী করো এবং তোমাদের শাসকবর্গের তাবেদারী করো)।

হজরত আমির আবদুল্লাহ খানের এখলাসে সন্তুষ্ট হয়ে হাদিয়া কবুল করলেন। সেদিন থেকে আমির আবদুল্লাহ প্রতিদিন সকালে হজরতের খেদমতে হাজির হতে লাগলেন।

একবার একজন দরবেশ হজরতের সঙ্গে সফরে ছিলেন। তখন রাত। পথ চলতে চলতে হঠাৎ দরবেশের পায়ে একটা কাঁটা বিঁধে গেলো। কাঁটা বিঁধার কথা শুনে হজরত আমকাংগী র. বললেন, 'ভাই, পায়ে কাঁটা ফুটলে তবেই তো হাতে ফুল আসবে।'

একবার তিনজন মাদ্রাসার ছাত্র নিজেদের মধ্যে যুক্তি পরামর্শ করলো, হজরতের খানকায় যেতে হবে। তাঁর কাশফ্ কারামত এবং বুজর্গি পরীক্ষা করে দেখতে হবে। প্রথম ছাত্র মনে মনে ঠিক করলো, হজরত যদি আমাকে অমুক ধরনের খানা খেতে দেন, তবে আমি বুঝবো তিনি সাহেবে কারামত।

দ্বিতীয় ছাত্র মনে মনে ভাবলো, তিনি যদি আমাকে মেওয়া খেতে দেন, তবে আমি তাকে অলিআল্লাহ বলে স্বীকার করবো।

তৃতীয় ছাত্র চিন্তা করলো যদি অমুক সুন্দর ছেলেটি আমার কাছে আসে, তবে আমি তাঁর কাশফের অনুরাগী হবো। তিনজন ছাত্র একসঙ্গে হজরতের খানকায় এসে পৌঁছলেন। হজরত তিনজনেরই ইচ্ছা পৃথক পৃথক ভাবে পূরণ করলেন।

তারপর বললেন, দরবেশগণ যে হালাত ও কামালাত লাভ করেন, তা শরীয়তের আমলের মাধ্যমেই লাভ করেন। তাই শরীয়তের খেলাফ কাজ তাঁদের দ্বারা সম্পন্ন হয় না।

তারপর আবার বললেন, দ্বীনের বুজর্গগণের নিকট কোনো মোবাহ্‌ কাজের জন্য আসা উচিত নয়। কারণ তাদের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন হালের সৃষ্টি হয়। সেজন্য অপ্রয়োজনীয় কাজের দিকে তাঁদের নজর থাকে না। এরকম নিয়ত করে তাঁদের কাছে এলে আগমনকারী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বুজর্গদের সোহবতের বরকত থেকে তারা বঞ্চিত হয়। কারামতের কোনো নিশ্চয়তা নেই। আল্লাহ্‌পাকের রেজামন্দি হাসিলের বিশুদ্ধ উদ্দেশ্য নিয়ে তাঁদের সোহবতে আসা দরকার। তাহলেই আগমনকারী তাঁদের রূহানী শক্তি দ্বারা প্রভাবান্বিত হতে পারে এবং ফায়দা লাভ করতে পারে।

আট

মাওরা উন্নাহার।

মোহাম্মদ বাকী বিল্লাহ্‌ মাওরা উন্নাহারে পৌঁছলেন। এর আগেও তিনি এ শহরে এসেছেন। কতো ফকিরের দরবারে ঘুরেছেন। এ পথ সে পথ। এ গলি সে গলি সব কিছু চেনা।

কিন্তু আজ মাওরা উন্নাহারের একি রূপ। একি সৌন্দর্য, একি স্নিগ্ধ স্বাগতঃ রূপ আজ তিনি দেখছেন এই নগরীর। কই আগে তো কখনো এই নূরানীরূপ তাঁর চোখকে এমন মুগ্ধ করেনি, হৃদয়কে করেনি আলোড়িত।

আজ যে এই শহরে এই স্থানে মোর্শেদের সাথে মিলন হবে। সেই মিলনের পূর্বরাগের কারণেই যে সারা শহর আন্দোলিত হচ্ছে। মাওরা উন্নাহার। প্রিয় মোর্শেদের বাসভূমি মাওরা উন্নাহার।

হজরত বাকী বিল্লাহ্‌ র. দরবারে হাজির হলেন। হজরত খাজেগী আমকাংগী র. এর পবিত্র দরবার। মোর্শেদের অবারিত দরবার।

হজরত আমকাংগী র. প্রথম দর্শনেই বিমুগ্ধ হলেন। অবাক হয়ে দেখলেন, ইশকের আগুনে পোড়ানো পবিত্র তুর পর্বতের মতো মোহাম্মদ বাকী বিল্লাহ্‌ র. এর আশেকী চেহারা মোবারক।

তিনি মোহাম্মদ বাকী বিল্লাহ্‌কে বায়াত করালেন। তারপর থেকে দিনরাত তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই সময় কাটাতে লাগলেন। অন্য কোনো দিকে নজর নেই। মনে হয় অন্য কোনো দিকে নজর দিবার প্রয়োজনও নেই।

মোহাম্মদ বাকী বিল্লাহ্ ধন্য হলেন। এতদিনের তৃষ্ণা যেনো এবার পেয়েছে তার কাংখিত সুরা। তিনি প্রাণ ভরে পান করতে লাগলেন। দিন রাত সব সময় পান করেও যেনো তৃষ্ণা মেটে না, আশা মেটে না।

একান্ত নিভৃত মহফিল। আর কেউ নেই। শুধু দু'জন। হজরত খাজেগী আমকাংগী র. আর হজরত মোহাম্মদ বাকী বিল্লাহ্ র.। মুখোমুখি দু'জন। যেনো দু'জনেই দু'জনের মধ্যে একাকার হয়ে যেতে চান।

এভাবে তিন দিন কাটলো। মোহাম্মদ বাকী বিল্লাহ্ তাঁর সমস্ত হাল বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করলেন প্রিয় মোর্শেদের কাছে। বর্ণনা করার মতো মোর্শেদ যে এবার মিলেছে। যার কাছে মেলে ধরা যায় হৃদয়ের প্রতিটি পরত– তিনিই তো মোর্শেদ।

হজরত খাজেগী আমকাংগী র. তাঁকে অনেক নতুন ভেদ, অনেক নতুন তত্ত্ব শিক্ষা দিলেন। নিজের বাতেনী খাজানা তিনি উজাড় করে দিলেন মোহাম্মদ বাকী বিল্লাহ্‌র বুকে।

তারপর এরশাদ করলেন, 'আল্লাহ্‌তায়ালার সীমাহীন রহমত এবং নকশবন্দিয়া তরিকার বুজর্গগণের রূহানী তরবিয়তে কামালাত অর্জনের সব কাজ আপনার শেষ হয়েছে। এখন আপনার ডাক পড়েছে হিন্দুস্তানে। আপনাকে হিন্দুস্তান যেতে হবে। আপনার বরকতে এই সিলসিলা সেখানে প্রসার লাভ করবে। সেখানে অনেক তালেবে মাওলা আপনার ফয়েজ ও বরকতের গভীর সমুদ্রে ডুব দিয়ে তুলে আনবে মারেফতের অজস্র অমূল্য মণি-মানিক।

মোহাম্মদ বাকী বিল্লাহ্ বিস্মিত হলেন। এ কি কঠিন দায়িত্ব। কোথায় নকশবন্দিয়া তরিকার উচ্চ শান– কোথায় তাঁর মতো নিকৃষ্ট ব্যক্তি। কার উপরে কি দায়িত্ব এ যে নেসবতে সিদ্দিকীর আমানত। এযে হজরত রসুলেপাক সল্লাল্লহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের জিমনি হজরত আবুবকর সিদ্দিক রা. এর বুকের নূর, যা ক্রমাগত বুক থেকে বুকে এ পর্যন্ত জ্বলে আসছে। এক প্রদীপের আলো থেকে লক্ষ লক্ষ প্রদীপ, কোটি কোটি মশাল প্রজ্জ্বলিত হয়ে আসছে। সেই নূর যে এবার তাঁরই অন্তরে জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে। সঙ্গে দেয়া হয়েছে কঠিন পবিত্র দায়িত্ব। হিন্দুস্তানের আশেকগণের দিলে সেই নূর জ্বালাতে হবে। অনেকের বুকে। অনেক দুর্ভেদ্য অন্ধকার।

অত্যন্ত আজিজির সঙ্গে মোহাম্মদ বাকী বিল্লাহ্ মোর্শেদের কাছে নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করলেন। ওজর দেখালেন।

কিন্তু হজরত খাজেগী আমকাংগী র. অনড়। এ পবিত্র দায়িত্ব তাঁকেই পালন করতে হবে। শেষে তিনি এস্তেখারা করবার এজাজত দিলেন।

মোহাম্মদ বাকী বিল্লাহ্ এস্তেখারা করলেন। তিনি দেখলেন এক অদ্ভূত স্বপ্ন। দেখলেন, একটি গাছে একটি তোতা পাখি বসে আসে। কি খুবসুরত। কি সুন্দর। এতো সুন্দর তোতা পাখি হয়! তিনি বেচয়েন হয়ে পড়লেন। ভাবতে লাগলেন– তোতা যদি ধরা দিতো, যদি তাঁর হাতে এসে বসতো তবে মনে হয় তাঁর হিন্দুস্তান সফর সফল হতো। এ কথা খেয়াল হতেই তোতা তাঁর হাতে এসে বসলো।

তোতা ধরা দিয়েছে। পোষ মেনেছে। বেচয়েন দিল স্থির হয়েছে। তিনি তোতাকে খুব আদর করলেন। এ তোতা তিনি কোথায় রাখবেন ভেবে পেলেন না। সোহাগভরে তোতার মুখের কাছে তিনি নিজের মুখ আনলেন। তারপর জিভের লালা তোতার মুখে ঢেলে দিলেন। তোতাও তাঁর মুখ ভরে দিলো চিনি দিয়ে। কি আজব তোতা।

হজরত খাজেগী আমকাংগী র. এর নিকট তিনি স্বপ্নের সমস্ত ঘটনা জানালেন। হজরত আমকাংগী এরশাদ করলেন, 'তোতা হিন্দুস্তানের পাখি। এ ঘটনার অর্থ হচ্ছে এই যে, হিন্দুস্তানে আপনার তরবিয়তের ফলে এক অসামান্য অলি-আল্লাহ্ আত্মপ্রকাশ করবেন। যে অলি-আল্লাহ্‌র নূরে শুধু হিন্দুস্তান নয়– সমস্ত জাহান আলোকিত হয়ে উঠবে। আপনিও তাঁর নিকট থেকে অনেক ফায়দা লাভ করবেন।

এবার যেতেই হবে। মোর্শেদের হুকুমের সঙ্গে স্বপ্নে হিন্দুস্তানের প্রতীক তোতা পাখির দর্শন লাভ হয়েছে। ইঙ্গিতবহ সেই খুবসুরত জান্নাতি তোতা পাখি। তাকে খুঁজে বের করতে হবে। হৃদয়ের সকল বাতায়ন উন্মুখ হয়ে রয়েছে সে তোতা পাখির জন্য। প্রেমের এই নিভৃত নিকুঞ্জে, নেসবতে সিদ্দিকীর এমনি পবিত্র কাননে প্রস্ফুটিত বেহেশতী ফুলের বিশেষ সৌরভ যে ক্রমশঃ উতলা হয়ে উঠেছে। গৌরবময় এই খাস খোশ খবরীর তিনি বার্তা বাহক। সেই মহা মিলনের মিলন সেতু যে তিনি, তিনি যে তার অগ্রদূত। মক্কা, মদীনা, বোখারা-তারপর হিন্দুস্তানের সঙ্গে সংযোগরক্ষাকারী সেই মিলন সেতু তিনি। তাঁর বুক আনন্দে উথলে উঠে। সেই অচিন তোতা পাখির জন্য তাঁর হৃদয় আকুল হয়ে উঠে।

হজরত বাকী বিল্লাহ্ প্রস্তুত হলেন। গুছিয়ে নিলেন সফরের সমস্ত আয়োজন।

এদিকে হজরত খাজেগী আমকাংগী র. এর একজন প্রধান খলিফা ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠলেন। কি আশ্চর্যের ব্যাপার! কতো পুরানো খাদেম রয়েছেন এই দরবারে। তাঁরা কতোকাল ধরে হজরতের খেদমতে নিয়োজিত। অথচ কোথাকার কে একজন এসে সব লণ্ডভণ্ড করে দিলো। দরবারে যেনো আর কেউ নেই। শুধু বাকী বিল্লাহ্– আর বাকী বিল্লাহ্। এই কয়েকদিনের মধ্যে তাঁকে দেয়া হলো দুর্লভ খেলাফতের মনসব। বিরাট মর্যাদা ও দায়িত্ব দেয়া হলো হিন্দুস্তান সফরের।

হজরত আমকাংগী র. সংবাদ অবগত হলেন। তিনি তখন সবার সামনে এরশাদ করলেন, 'আমার দোস্তগণ নাদান। তাঁরা বুঝতে পারেননি আসল ঘটনা কি? মোহাম্মদ বাকী বিল্লাহ্ আমার দরবারে এসেছিলেন পূর্ণ কামালাত অর্জন করেই। এখানে শুধুমাত্র সে কামালাতের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জ্ঞানের উৎকর্ষতা সাধন হয়েছে। এখানে শুধু কামালাতের শেষ অধ্যায় সংযোজিত হয়েছে।

লাজারস হারকে চজুনা আয়দ চুনা রাওয়াদ
পূর্ণতার দখল যার হৃদয় শিবিরে
পূর্ণতা নিয়েই তিনি পুনঃ যান ফিরে।

নয়

কাফেলা চলেছে।

ছোট্ট কাফেলা।

হজরত খাজা বাকী বিল্লাহ্ র. তাঁর বিবি সাহেবা এবং তাঁর মা। তিন জনের ক্ষুদ্র কাফেলা। নিসর্গের নীরব অভিনন্দনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে একান্তজনের ক্ষুদ্র কাফেলা।

কিন্তু কেউ কি জানে, এই পবিত্র কাফেলা কিসের জন্য আজ জন্মভূমি ত্যাগ করে সুদূরের পথে পাড়ি জমিয়েছে। কি পবিত্র আমানত এই কাফেলার নেতা তাঁর বুকের ভিতর বহন করে নিয়ে চলেছেন।

আল্লাহ্পাকের ইচ্ছা, এবার তিনি হিন্দুস্তানের আশেকদেরকে সর্বশ্রেষ্ঠ নেসবত– নেসবতে সিদ্দিকীর নূর দিয়ে সম্মানিত করবেন। বুক থেকে বুকে ছড়িয়ে পড়বে সেই নূরের আদিগন্ত প্রবাহ। প্রেম আর প্রেম মিলে নূরের সয়লাব। মারেফত আর মারেফতে তরঙ্গায়িত মুখর মহফিল। ভাষায় যা প্রকাশ করা যায় না, কোনো ধারণায় যা ধারণ করা যায় না– সেই জান্নাতি নূর এবার ছড়িয়ে পড়বে হিন্দুস্তানের ঘরে ঘরে, হৃদয়ে হৃদয়ে, আলোর বাঁধনে দশ দিগন্ত উদ্ভাসিত করে। সেই আলোকের নিশান বরদার হয়ে এগিয়ে চলে ছোট্ট কাফেলা।

দশ

লাহোর।

সেই প্রাচীন নগরী লাহোর।

এখানে কাফেলা এসে থামলো।

হজরত খাজা বাকী বিল্লাহ্ র. এখানে ঘর বাঁধলেন। আল্লাহ্র ফকিরের ঘর। আড়ম্বর নেই। জৌলুস নেই। অথচ সে ঘরে জ্বলে জান্নাতের শামাদান। দিন রাতে, বিরতিহীন-বিরামহীন।

ক্রমে ক্রমে লাহোরের অধিবাসীগণ এসে ভিড় করে এ দরবারে। হজরত খাজা বাকী বিল্লাহ্ র. এর দরবারে। আলেম, ফাজেল, সাধারণ মানুষ, সবাই বিস্মিত হয়। পুলকিত হয়। ধন্য হয়।

দরবার ভরে উঠে। মজলিশ জম জমাট হয়। আঁধার সরে যায়। জারী হয় নূরের লহর।

এভাবে এক বছর পার হয়ে গেলো। কিন্তু হজরতের মনে শান্তি নেই। কিসের যেনো অতৃপ্তি এই মহফিলের মাঝে বার বার জমাট ব্যথার মতো হৃদয়ে উথলে উঠে। হিন্দুস্তানের তোতাপাখি কই? সেই খুবসুরত তোতাপাখি। স্বপ্নে দেখা সেই বিস্ময়কর বিহঙ্গ। কোথায় তার আবাস। কোন ঠিকানায় পাওয়া যাবে তার সন্ধান।

হজরত খাজা বাকী বিল্লাহ্ র. স্থির করলেন, আবার পথ চলতে হবে। এখানে আর নয়। এখানকার কাজ শেষ হলেও মূল কাজ তো এখনো বাকী। মূল আমানত তো এখনও হৃদয়ান্তর করা হয়নি। সেই তোতাপাখির দেখা তো এখানে পাওয়া যাবে না। আরো পথ পাড়ি দিতে হবে। হজরত স্থির করলেন, এবার দিল্লী যেতে হবে।

সেই ছোট্ট কাফেলা আবার প্রস্তুত হলো। সামান বাঁধা হলো। যাত্রা শুরু হলো। কাফেলা আবার চলতে শুরু করলো। দিল্লীমুখী কাফেলা। অনেক পথ পাড়ি দিতে হবে। হনুজ দিল্লী দূর আস্ত।

পথে যখনই কোনো দুঃস্থ রোগগ্রস্ত পথচারীর সাক্ষাৎ মিলে, তখনি হজরত খাজা তাঁর সোয়ারী থেকে নেমে পড়েন। পথচারীকে নিজের সোয়ারীতে বসান। পাছে লোকে তাঁকে চিনতে পারে, তাই নিজের বদন মোবারক তিনি ঢেকে নেন চাদরে।

প্রায় প্রতি মাইল যেতে না যেতেই এরকম ঘটনা ঘটতে থাকে। এ যেনো সেই ঘটনার নায়কের প্রতিচ্ছবি, মহানবী স. যাঁকে ডেকেছিলেন আল ফারূক বলে। যিনি চাকরকে উটের পিঠে বসিয়ে নিজে উটের রশি ধরে মরুপথ চলেছিলেন। হজরতের আচরণে সেই কাহিনীই যেনো নয়শ' বছর পরে আবার জীবন্ত হয়ে ওঠে।

এগারো

কাফেলা থামলো। রাত হয়ে আসছে। এখানে বিশ্রাম নিতে হবে। তিনি জানতে পারলেন, এ স্থানের নাম সেরহিন্দ। সেরহিন্দ! কি অপরূপ নাম। স্থানের নাম শুনেই অন্তর কেমন করে উঠে। হজরতের মনে অবর্ণনীয় ভাবের উদয় হয়। এ স্থান এরূপ কেনো?

রাতে স্বপ্ন দেখলেন, তিনি এক কুতুবের পাড়ায় এসে পড়েছেন। ফজরের নামাজের পর তিনি শহরে বের হলেন । অনুসন্ধান করে ফিরতে লাগলেন, কোথায় সেই কুতুব যাঁর শহরে তিনি মেহমান হয়ে এসেছেন।

তিনি বিভিন্ন দরবেশের আস্তানায় গেলেন। কতো দরবেশ দেখলেন। কিন্তু কারো মধ্যেই কুতুবিয়াতের চিহ্ন দেখতে পেলেন না। শেষে ভাবলেন, মনে হয় সেই কুতুব এখনও অপ্রকাশিত আছেন। পরে সময় হলে হয়তো তিনি প্রকাশিত হবেন।

কাফেলা আবার চলতে শুরু করলো। কয়েকদিন কেটে গেলো।

দিল্লী নজরে আসছে। আউলিয়ার শহর দিল্লী। কতো বুজর্গ আউলিয়ার সমাবেশ এই শহরে। হজরত কুতুবুদ্দিন বখতিয়ার কাকী র. হজরত নিজামুদ্দিন র. হজরত নাসিরউদ্দিন চেরাগে দেহলবী র. এবং আরো কতো বুজর্গ শুয়ে আছেন এখানে। ইসলামের সিপাহসালারগণ রণবিজয়ের পর এখানে বিশ্রাম গ্রহণ করছেন।

হজরত বাকী র. এর বিশ্রামের কোনো অবকাশ নেই। নকশবন্দিয়া তরিকার যে বীজ, ইশকে মাওলার যে অংকুর তিনি বুকের ভিতরে বয়ে নিয়ে এনেছেন– তোতাপাখির দেশের সেই খোশনসীবের কাছে, তার সমস্ত দায়িত্ব অর্পণ না করা পর্যন্ত তাঁর বিশ্রাম নেই।

শুধু দিন গুজরানের জন্য একটু ঠাঁই দরকার। হজরত সেই উদ্দেশ্যে তাঁর বাসস্থানের স্থান নির্বাচন করলেন ফিরোজী কেল্লার কাছে। এখানকার মাটি যেনো তাঁকে মমতায় জড়িয়ে ধরে। এ মাটির ঘ্রাণ যেনো তাঁর শরীরে বুলিয়ে দেয় স্নেহমাখা কোমল সোহাগ।

কুটির তৈরী হলো। জীর্ণ কুটির। মহানবী স. যেমন মদীনায় এসে কুটির প্রস্তুত করেছিলেন। তাঁর কথা বোধ করি হজরতের মনে পড়ে গিয়েছিলো। এ পথের শিক্ষাই যে এরকম। সবকিছুই হতে হবে মহানবী স. এর অনুসরণে।

হজরত তাঁর কুটিরের পাশে আড়ম্বরহীন খানকা প্রস্তুত করলেন। এ খানকা যেনো সেই খেজুর পাতার মসজিদ– মসজিদে নববীর প্রতিচ্ছায়া।

ফুলের সুবাস স্বাভাবিক নিয়মেই চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। আউলিয়া সম্প্রদায় তো ফুলেরই মতো। হরিণী তার নাভিতে কস্তুরী নিয়ে যেমন ছুটে বেড়ায়, আর তার গন্ধে উন্মাতাল হয় নিসর্গ বনরাজী– তার চেয়েও বেশী ব্যাকুল হয়ে ওঠে আশেকের দল– যারা সন্ধান পায় আউলিয়ার হৃদয় কোরকে বিকশিত ইশক-কুসুমের।

হজরতের বেলায়ও তাই হলো। ক্রমে ক্রমে নকশবন্দি এই কুসুমের সুবাস চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো।

হজরত নীরব প্রান্তরের মতো। মৌন পাহাড়ের মতো। বিশাল বনরাজির মতো। মৌনতার মধ্যেই যেনো তাঁর আসল আবাস।

তবু তিনি আগন্তুকের আর্জির প্রতি লক্ষ্য রাখেন। তাঁদের প্রশ্নের জবাব দেন। সাক্ষাৎকারীদের সাথে হাসিমুখে আলাপ করেন। বয়ান করেন দ্বীনের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে। কিন্তু কোনো কিছুই সীমা অতিক্রম করে না। এক অপূর্ব পরিমিতি বোধ তাঁর স্বভাবকে সব সময় সৌন্দর্যময় করে রাখে।

কেউ কোনো জটিল মাসআলার সমাধান চাইলে তিনি তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেন, যাতে সব অস্পষ্টতা পুরাপুরি দূর হয়ে যেতে পারে, যেনো সে সম্পর্কে কারো মনে কোনো সন্দেহের অবকাশ না থাকে।

সব সময় নিজের দোষত্রুটির প্রতি লক্ষ্য রাখা ছিলো তাঁর বিশেষ অভ্যাস। নিজের সম্পর্কে কোনো সুধারণা কখনোই তাঁর অন্তরে ঠাঁই পেতো না।

একবার তাঁর এক প্রতিবেশীকে পুলিশে ধরে নিয়ে গেলো। সে ছিলো অসৎ ও দুষ্ট প্রকৃতির। বিভিন্ন দুষ্টামির মাধ্যমে সে হজরত খাজাকে মাঝে মাঝেই কষ্ট

দিতো। হজরত খাজার এক মুরিদ এসব সহ্য করতে না পেরে একদিন তাকে পুলিশে ধরিয়ে দিলো। হজরত জানতে পারলেন সব। তিনি মুরিদকে তিরস্কার করলেন। জবাবে মুরিদ বললেন, 'হজরত, সে লোক ভয়ানক রকমের দুষ্ট এবং ফাসেক।' মুরিদের জবাব শুনে হজরত খাজা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে উচ্চারণ করলেন 'আহ্!' তারপর বললেন, 'আপনি নিজেকে নিষ্পাপ ধারণা করেন বলেই তো অপরকে আপনার ফাসেক আর দুষ্ট নজরে আসে। কিন্তু আমার উপায় কি? আমার কাছে যে আমার অস্তিত্বের চেয়ে খারাপ কোনো কিছুই নজরে আসে না।'

হজরত ছোট বড় সব আমলের ব্যাপারে দ্বীনদার ফেকাহ বিশারদগণের ফয়সালা মেনে নিতেন। ওলামা ও সৈয়দগণ তাঁর দৃষ্টিতে ছিলেন বিশেষ মর্যাদাসম্পন্ন।

কেউ মুরিদ হবার এরাদা নিয়ে এলে তিনি অনেক ওজরখাহী করতেন। নিজের অক্ষমতা ও অযোগ্যতা সম্পর্কে তাঁদের কাছে বলতেন। তাঁর কথা শুনে কেউ ফিরে যেতেন। কেউ থাকতেন। যাঁরা দৃঢ়তার সঙ্গে তরিকার পথকে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরতে চাইলেন, তাঁরা কিছুতেই হজরতের দরবার ত্যাগ করতে রাজী হতেন না। তখন শেষ পর্যন্ত হজরত তাঁদেরকে কবুল করতেন। অন্তরের প্রেম দিয়ে, প্রেমের সুবাস দিয়ে তাঁদের রূহানী তরবিয়াত করতেন।

আকর্ষণ টুটে গেছে আখেরাত আর দুনিয়ার
তবু নাহি চায় ছেড়ে যেতে মন, এই দরবার।

অনেক সময় তিনি তাঁর সাচ্চা মুরিদগণের নিকট বলতেন, 'দেখো। তোমরা আমার সম্পর্কে যেরকম উচ্চ ধারণা পোষণ করো, আমি কিন্তু তার উপযুক্ত নই। তোমরা বরং অন্য কোথাও গিয়ে খাঁটি এবং কামেল পীর তালাশ করো। সে রকম পীর পেলে এই অধমকেও সংবাদ দিও। আমিও তাঁর খেদমতে হাজির হয়ে আমার দিলের দরদের চিকিৎসা করাবো।'

বারো

সেই খোরাসানী যুবক। আজব যুবক। সুদূর খোরাসান থেকে তিনি এসেছেন এখানে। দারুল আউলিয়ার শহর দিল্লীতে এসেছেন তিনি কামেল পীর তালাশ করতে। এসে নিজের আস্তানা গাড়লেন হজরত কুতুবুদ্দিন বখতিয়ার কাকী র. এর

মাজার শরীফে। সেখানে তিনি চিল্লা করতে শুরু করলেন। আর তাঁর রূহের তোফায়েলে কামেল পীরের সন্ধান লাভের উদ্দেশ্যে আল্লাহ্‌পাকের দরবারে প্রার্থনা জানাতে লাগলেন। এইভাবেই অনেক দিন কেটে গেলো। তিনি তাঁর মকছুদ হাসিলের ব্যাপারে কোনো কিছু জানতে পারলেন না। হঠাৎ এক রাতে তিনি স্বপ্নে দেখলেন, হজরত কুতুবুদ্দিন বখতিয়ার কাকী র. তাঁকে বলছেন, 'শহরে নকশবন্দিয়া সিলসিলার একজন বুজর্গের শুভাগমন হয়েছে। তুমি তাঁর সোহবতে গিয়ে ফয়েজ হাসিল করো।'

যুবক ঐ দিনই হজরত খাজা বাকী বিল্লাহ র. এর দরবারে হাজির হলেন। হজরতকে তাঁর স্বপ্ন সম্পর্কে বললেন এবং আরজ করলেন, মেহেরবানী করে আমাকে কবুল করে নিন।'

হজরত খাজা জবাব দিলেন, 'আমি এরকম মহান কাজের উপযুক্ত নই। মনে হয় স্বপ্নে অন্য কোনো বুজর্গের প্রতি ইশারা করা হয়েছে। আপনি মেহেরবানী করে অন্য কোথাও তালাশ করুন।'

হজরত খাজা এমনভাবে একথা বললেন, যুবক তা বিশ্বাস করতে বাধ্য হলেন। তিনি নিজ আস্তানায় ফিরে গেলেন। কিন্তু ঐ রাতে তিনি আবার স্বপ্নে হজরত কাকী র.কে দেখলেন। তিনি বলছেন, 'যাঁর কথা আমি বলেছিলাম, সেই ব্যক্তির নিকটই তুমি গিয়েছিলে। তিনি অত্যন্ত বিনয়ী এবং নিজের সম্পর্কে কখনোই উত্তম ধারণা পোষণ করেন না। তাই তোমার প্রস্তাবে তিনি অসম্মতি প্রকাশ করেছেন।

যুবক আবার গিয়ে হাজির হলেন হজরত খাজার খানকায়। পুনরায় স্বপ্ন সম্পর্কে বললেন। হজরত এবারেও ওজর তুললেন। কিন্তু যুবক নাছোড়বান্দা। শেষে হজরত যুবককে কবুল করলেন।

তেরো

মীর্জা হুসামুদ্দিন র.

আল্লাহ্ প্রেমের দরদ ভরা দিল নিয়ে তিনিও কামেল পীর তালাশ করে ফিরছিলেন। তিনিও একদিন হজরত খাজার দরবারে এসে হাজির হলেন। আরজ

করলেন, 'হজরত, আপনার তরবিয়ত চাই। আল্লাহ্প্রাপ্তির পথ চাই। আপনি আমাকে আপনার মুরিদগণের দলভুক্ত করুন।'

হজরত খাজা তাঁর স্বভাবসুলভ অসম্মতি প্রকাশ করলেন। নিজের সম্পর্কে দীনতা প্রকাশ করে অন্য কোথাও তালাশ করতে বললেন।

মীর্জা হুসামুদ্দিন আদব রক্ষার জন্য হজরতের হুকুম মোতাবেক কামেল পীরের তালাশে বের হলেন। তিনি আগ্রার দিকে গিয়ে কিছুদিন ঘোরাফিরা করলেন। শেষে মনে মনে বুদ্ধি আঁটলেন, ফিরে গিয়ে হজরত খাজার নিকট আরজ করবেন, 'হজরত। আপনার দরবারেই ফিরে এসেছি।'

সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পুনরায় তিনি দিল্লীর পথ ধরলেন। হঠাৎ শুনতে পেলেন, পাশের সরাইখানা থেকে কে যেনো দরদভরা সুরে কবিতা আবৃত্তি করছেন– শায়েখ সাদী শিরাজী র. এর সেই বিখ্যাত কবিতা-

'তুখাহী আসতীন আফসা' ওখাহী দামন আন্দর কস,
মগুস হরগিজ নাখাহাদ রফও আয ছুকানে হালওয়ারী।
আমায় কবুল কর অথবা তাড়াও,
এ দীওয়ানা দরবার ছেড়ে যাবে না কোথাও।

মর্মস্পর্শী সেই কবিতা শুনে মীর্জা হুসামুদ্দিন বেকারার হয়ে পড়লেন। বুকে ইশকের জোয়ার উথাল পাথাল করে উঠলো। বুক জুড়ে মরুর তৃষ্ণা। এ তৃষ্ণার পানি তো আর কোথাও নেই। হজরত খাজার দরবার ছাড়া অন্য কোথাও যে এ পিপাসার পানি পাওয়া যাবে না।

দুর্নিবার আকাঙ্খা নিয়ে হজরত খাজার দরবারে ফিরে এলেন তিনি। সফরের সমস্ত বৃত্তান্ত খাজাকে খুলে বললেন। হজরত খাজার দিলেও ইশকের জোয়ার উথলে উঠলো। তিনি মীর্জা হুসামুদ্দিনকে কবুল করে নিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই মীর্জা হুসামুদ্দিন হলেন তাঁর সর্বাপেক্ষা ঘনিষ্টতম সহচর।

চৌদ্দ

লাহোরের এক দরবেশ একদিন অদ্ভুত এক স্বপ্ন দেখলেন। দেখলেন, হজরত খাজা বাকী বিল্লাহ্ র. একটি ঘোড়ার উপরে সোয়ার হয়ে পথ চলছেন। ঘোড়ার

রঙ কালো। ঘোড়ার পায়ের রঙ শাদা। সঙ্গে অনেক লোক। সবাই একবাক্যে বলছেন, 'ইনিই হচ্ছেন এ জামানার কুতুব।'

স্বপ্ন দেখে দরবেশের বিস্ময়ের অবধি থাকলো না। কে জানতো তখন যে, তিনি এ জামানার কুতুব। হজরত যখন লাহোরে ছিলেন তখন এই স্বপ্ন দেখলে কি উপকার না হতো। প্রাণভরে তাঁর সোহবত এখতেয়ার করতে পারতেন। খেদমত করতে পারতেন। এখনতো তিনি বহু দূরে। সেই দারুল আউলিয়ার শহর দিল্লীতে।

তবুও তাঁর কাছে যেতে হবে। জামানার কুতুবের সোহবত এখতেয়ার করে জীবন ধন্য করতে হবে।

দরবেশ দিল্লীর পথে রওয়ানা হলেন। কয়েকদিন ধরে অবিশ্রামভাবে পথ চলে শেষে পরিশ্রান্ত হয়ে হজরত খাজার দরবারে এসে হাজির হলেন এবং তাঁর নিকট বায়াত হবার এরাদা প্রকাশ করলেন। হজরত খাজা তাঁর স্বভাব অনুযায়ী নিজ দীনতা ও অক্ষমতা প্রকাশ করলেন। এতে দরবেশ হতাশাগ্রস্ত এবং উদভ্রান্ত হয়ে গেলেন। তিনি বিষণ্ন মনে মসজিদে অবস্থানরত অন্যান্য দরবেশগণের সামনে হাজির হয়ে প্রলাপ বকতে শুরু করলেন। চিৎকার করে তিনি বলতে লাগলেন, 'দোস্তগণ। এসব কি ধরনের রীতিনীতি– এ কিরূপ ছলনা। এই বুজর্গ স্বপ্নে দেখা দিয়ে আমাকে দীওয়ানা করলেন। আমি ঘরবাড়ী বিবিবাচ্চা ফেলে তাঁর দরবারে ছুটে এলাম। আর তিনি কিনা আমাকে ফিরিয়ে দিলেন। প্রত্যাখ্যান করলেন। হায়, এখন আমি কি করি– কোথায় যাই।'

আগন্তুক দরবেশ কথাগুলো বলে কাঁদতে শুরু করলেন। তাঁর দরদভরা কান্না দেখে অন্যরাও অশ্রু সম্বরণ করতে পারলেন না। সবাই কেঁদে ফেললেন।

কান্নার শব্দ শুনে হজরত খাজা তশরীফ আনলেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'কি হয়েছে।'

উপস্থিত দরবেশগণ সব ঘটনা তাঁকে খুলে বললেন।

সমস্ত ঘটনা শুনে হজরত মৃদু হাসলেন। তিনি আগন্তুক দরবেশকে নিজের দিকে ইশারা করলেন এবং জিকির ও জজ্বের তালীম দিলে্ন।

তা নানীরাদ তিফল কায় জুসাদ লবণ,
তা নাগীরাদ আবর কায় খানদাদ্ দমন।

না কাঁদলে শিশু, ওঠেনা মায়ের দুধে বান,
না ঝরালে মেঘমালা বারি, হাসে না বাগান।

পনেরো

খাজা বোরহান র.

তিনি দেহিন্দি খাজেগানের সোহবত ও খেলাফত প্রাপ্ত পীর ছিলেন। খাজা বোরহান হজরত খাজা বাকী বিল্লাহ্ র. এর খেদমতে হাজির হয়ে ফয়েজ হাসিলের জন্য আরজ জানালেন।

হজরত খাজা তাঁকে তাঁর সুরত মোবারক সব সময় খেয়াল করবার তালিম দিলেন। খাজা বোরহান এতে বিস্মিত হলেন। তিনি তাঁর ঘনিষ্ঠ মহলের নিকট বললেন, 'এ মোরাকাবা তো প্রাথমিক স্তরের মুরিদগণের জন্য। হজরত যদি আমাকে মেহেরবানি করে আরও উচ্চস্তরের মোরাকাবার তালিম দিতেন তা'হলে ভালো হতো।'

তাঁর এ কথা শুনে বন্ধুরা বললেন, আদব রক্ষা করুন। হজরত খাজার এই তালিমেই সন্তুষ্ট থাকুন।

খাজা বোরহানের নিয়ত ও আকিদা ছিলো খাঁটি। তাই তিনি বন্ধুদের পরামর্শ অনুযায়ী হজরতের নির্দেশ মেনে নিলেন এবং হজরত খাজার সুরত মোবারকের মোরাকাবা শুরু করলেন। দুদিন যেতে না যেতেই তাঁর মধ্যে আশ্চর্য অবস্থার সৃষ্টি হলো। তিনি দেখলেন, হজরত খাজার সুরত শরীফের নূর তাঁকে পূর্ণরূপে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। তিনি আরও অবাক হয়ে দেখলেন, এক অতি উচ্চ রূহানী নেসবত তাঁর লাভ হয়েছে যা তিনি পূর্বে কখনো কল্পনাও করতে পারেননি।

খাজা বোরহান ছিলেন বয়োবৃদ্ধ এবং গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ। কিন্তু হজরত খাজার সুরত শরীফের মোরাকাবার ফলে তাঁর মধ্যে মহব্বতের গালবা এরূপ অবস্থার সৃষ্টি করতো যে, তিনি জমিন থেকে তিন চার হাত উঁচুতে লাফিয়ে উঠতেন। কখনো উঁচু দেয়াল থেকে, কখনো গাছের উপর থেকে নিজেকে মাটিতে নিক্ষেপ করতেন। যখন তাঁর এরূপ মত্ততা দেখা দিতো, তখন কয়েকজন শক্তিশালী যুবকও তাঁকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারতো না।

ষোল

দরবারে ক্রমেই ভিড় বেড়ে চলেছে।

আশেকের মজলিশ ক্রমেই পরিপূর্ণ হয়ে উঠে। অল্প দিনের মধ্যেই খাজা বাকী বিল্লাহ্ র. এর বুজর্গির খবর দূর দূরান্তে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। সবাই তাজ্জব হলেন। এই ভিনদেশী বুজর্গ কিরকম বুজর্গ! এতো অল্প সময়ের মধ্যে তিনি এতো জনপ্রিয় হয়ে উঠলেন কেমন করে।

শুধু সাধারণ মুরিদ নয়। অনেক পীরও যে পীর-মুরিদি ছেড়ে দিয়ে তাঁর খানকায় শরীক হয়ে নিজেদের ধন্য মনে করছেন।

অবস্থা এরকম দেখে কোনো কোনো ঈর্ষাপরায়ণ পীর হজরত খাজার বিরুদ্ধে বিভিন্ন প্রকার এসেম পড়া শুরু করলেন। কিন্তু ফল হলো বিপরীত। তাঁদের পড়া এসেমের প্রতিক্রিয়া তাঁদের নিজেদের দিকেই ফিরে যায়। অগত্যা আত্মসমর্পণ করা ছাড়া আর উপায় কি? অবশেষে তাঁরাও এসে হাজির হলেন হজরত খাজার দরবারে। ক্ষমা চাইলেন কৃত অপরাধের জন্য।

হজরতের হৃদয় ছিলো সমুদ্রের মতো উদার। রহমতের তরঙ্গ সে হৃদয়ের গভীর সমুদ্রে সারাক্ষণ আপন খেলায় মেতে থাকে। সেখানে কোনো আক্রোশ নেই, কলুষতা নেই। তাই তিনি সকলকে মাফ করে দেন। কাউকে কাউকে ঘনিষ্ঠ জনদের কাতারে সামিল করে নেন।

এরপর ক্রমে ক্রমে বিখ্যাত ব্যক্তিগণও হজরতের মজলিশে জমায়েত হতে লাগলেন। মুরিদ হতে শুরু করলেন। এলেন দিল্লীর শ্রেষ্ঠ আলেম মাওলানা আবদুল হক মোহাদ্দেসে দেহলবী র., বাদশাহর বিখ্যাত দরবারী শায়েখ ফরিদ র., সম্বলের বুজর্গ শায়েখ তাজ র. এবং আরো কতোজন।

হজরত খাজা প্রত্যেকের যোগ্যতা অনুযায়ী তালিম দেন। কাউকে জিকরে কলবী, কাউকে জিকরে জাত। আবার কাউকে জিকরে এসবাত, কাউকে রাবেতা।

প্রত্যেক মুরিদই নিজ নিজ যোগ্যতা অনুযায়ী হজরত খাজার নিকট থেকে ফায়দা হাসিল করতে লাগলেন। দিল্লীর দরবার ভরে গেলো আলোর বন্যায়। এ যে ফকিরের দরবার। বাদশাহর দরবারের জৌলুসও ম্লান হয়ে যায় এ দরবারের কাছে। যার চোখ আছে সেই দেখে, যার হৃদয় আছে সেই বুঝতে পারে এ দরবারের মর্তবা।

সতেরো

কি মধুর আখলাকে-করিমা হজরত খাজার। আখেরী জামানার পয়গম্বর মোহাম্মদুর রসুলুল্লাহ্ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মতো সুন্দর, নূরময়, প্রেমময়। হজরত খাজার বংশধারাও তো সেখানে গিয়েই মিশেছে, যে বংশে জন্ম নিয়েছিলেন মহানবী স.– সেই শ্রেষ্ঠ কোরায়েশ বংশে।

শুধু বংশ নয়। তিনি তো সেই নবীরই পূর্ণ অনুসারী। যাঁর অনুসরণ ছাড়া আল্লাহ্প্রাপ্তির আর দ্বিতীয় কানো পথ নেই।

যাঁকে অনুসরণ করা হয় তাঁর স্বভাবের প্রতিবিম্ব অনুসরণকারীর উপরেও পড়ে। মহানবী স. এর মতো তাই হজরত খাজার জীবনেও অনেক অলৌকিক ঘটনা ঘটেছিলো।

হজরত খাজা একবার ফরজ নামাজ আদায়ের জন্য লাহোরের এক মসজিদে গিয়েছিলেন। নামাজরত অবস্থায় হঠাৎ তার সীনা থেকে এক ভীষণ আওয়াজ শোনাগেলো। সবাই চমকে উঠলেন। নামাজ যখন শেষ হলো তখন তিনি তাড়াতাড়ি করে মসজিদ থেকে বের হয়ে গেলেন– পাছে এ ঘটনা কেউ জেনে ফেলে। শেষে নিজের আস্তানায় এসে তিনি আরও দু-একজনকে সঙ্গে করে পুনরায় জামাতে নামাজ আদায় করেছিলেন।

এ ঘটনা হজরত নূরনবী স. এর জীবনেরই প্রতিবিম্ব। মহানবী স. যখন নামাজে দাঁড়াতেন, তখন তাঁরও সীনা থেকে একরকম শব্দ বের হতো এবং সে শব্দ বহু দূর থেকেও শোনা যেতো।

নামাজের সময় মহানবী স. সামনে যেমন দেখতে পেতেন পিছনেও তেমনি দেখতে পেতেন।

হজরত খাজার জীবনেও এরকম ঘটনা ঘটেছে। একবার তিনি এক নামাজের জামাতে ইমামতি করছিলেন। জামাতের এক মুক্তাদি দেখলেন হজরত খাজা যেমন কেবলার দিকে মুখ করে আছেন, তেমনি একই সঙ্গে মুক্তাদির দিকেও মুখ করে আছেন এবং মোক্তাদীগণকেও দেখছেন। ঐ মোক্তাদি তখন ভীষণ ঘাবড়ে গেলেন। তাঁর সমস্ত শরীর থর থর করে কাঁপতে লাগলো। ঐ অবস্থায়ই নামাজ শেষ হলো। নামাজ শেষে মোক্তাদি হজরত খাজার নিকট তাঁর নামাজের হাল

বর্ণনা করলেন। সব শুনে হজরত খাজা মৃদু হেসে এ ঘটনা আর কারো কাছে বলতে নিষেধ করে দিলেন।

এসব ঘটনাতেই একথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, হজরত খাজা মহানবী স. এর পূর্ণ অনুসরণকারী ছিলেন। তাই রসুলেপাক সল্লাল্লহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের দুর্লভ স্বভাবসমূহ তাঁর জীবনেও প্রতিবিম্বিত হয়েছিলো। পার্থক্য শুধু এই যে, নবী করিম স. এর জীবনে যা প্রায় সময়ই প্রকাশ পেতো, তাঁর পূর্ণ অনুসরণকারী আউলিয়াগণের জীবনে হঠাৎ কোনো কোনো সময় তা প্রকাশ পায়।

এই জন্যই বুজর্গগণ বলেন, 'অনুসরণীয় ব্যক্তির গুণাবলীর নিদর্শন অনুসরণকারী ব্যক্তির জীবনেও প্রকাশিত হয়।'

মহানবী স. এর দিলে সৃষ্ট জীবের প্রতি ছিলো অসীম দয়া। হজরত খাজার অন্তরও ছিলো তেমনি আল্লাহ্পাকের সৃষ্ট জীবের প্রতি মমতায় ভরা।

তিনি যখন লাহোরে ছিলেন, তখন একবার সেখানে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিলো। সে সময় তিনি খাবার খেতে পারতেন না।

তাঁর সামনে খানা পেশ করা হলে তিনি তা ফেরত দিতেন। বলতেন, 'কেউ অভুক্ত থেকে কষ্ট পাবে আর আমরা তৃপ্তির সাথে খানা খাবো, এটা ইনসাফের পর্যায়ভুক্ত হতে পারে না।'

এ কথা বলে হজরত খাজা সমস্ত খানা অভুক্তদের মধ্যে বিতরণ করে দিবার নির্দেশ দিতেন। এভাবে ক্রমাগত কয়েকদিন ধরে তিনি অনাহারে দিন কাটাতেন।

একরাতের ঘটনা। তখন প্রবল শীত। হজরত গভীর রাতে তাহাজ্জুদ নামাজ পড়বার জন্য উঠলেন। দেখলেন, একটি বিড়াল শীতে কাতর হয়ে তাঁর লেপের উপরে ঘুমিয়ে রয়েছে। হজরত খাজা তাহাজ্জুদ নামাজ পড়লেন। কিন্তু পরে আর বিছানার কাছে গেলেন না। বিড়ালের কষ্ট হবে ভেবে বাকী রাতটুকু তিনি নিজেই শীতে কাপঁতে কাঁপতে কাটালেন।

আঠারো

আল্লাহ্র ওয়াস্তে যে অবনত হয় আল্লাহ্পাক তাঁর মর্যাদা বুলন্দ করেন। হজরতের জীবনে এই হাদিস শরীফের আশ্চর্য প্রতিফলন ঘটেছিলো।

মহান নকশবন্দিয়া সিলসিলার একজন অসামান্য বুজর্গ হয়েও তিনি নিজেকে অজ্ঞ ধারণা করতেন। আল্লাহ্‌কে না পাওয়ার জন্য তাঁর আফসোসের অন্ত ছিলো না। মারেফাতের অনন্ত সমুদ্রের পরিচয় কতোটুকু আর মানুষের পক্ষে জানা সম্ভব। বেমেছাল আল্লাহ্‌কে সীমার মধ্যে পাওয়া সম্ভব নয়। তাইতো খাঁটি আশেকের অন্তরে তৃপ্তি থাকে না, জ্ঞান আহরণের সীমা থাকে না, মারেফাতের অতল সমুদ্র থেকে প্রেমের অমূল্য মুক্তা আহরণের বিরাম থাকে না।

হজরত বিভিন্ন হালতের মধ্যে মাঝে মাঝে তাঁর নিজের রচিত রুবায়ী আবৃত্তি করতেন।

হে আশেক সতর্ক থাকো আদবে লেহাজে
আজীবন সজ্জিত থাকো সাধকের সাজে,
যদিও না পাও তুমি মিলন বারতা
নীরবে নিশ্চিহ্ন হও-কহিও না কথা।

তাঁর কোনো মুরিদকে যদি কখনো কোনো শরীয়তের খেলাফ কাজ করতে দেখতেন, তখন তাঁর অন্তর বেদনাহত হয়ে উঠতো। তিনি ব্যথিত কণ্ঠে বলতেন, আমার গোনাহ্‌র কারণেই এরূপ হয়েছে। যদি আমার মধ্যে এই ধরনের বদ স্বভাব না থাকতো তাহলে মুরিদের উপর তার প্রতিবিম্ব পড়তে পারতো না। হজরত খাজা সব সময় মুরিদগণকে নসিহত করে বলতেন, নিজেদের আমলকে নিজেদের চোখে সবসময় ত্রুটিপূর্ণ দেখা উচিত।

মজলিশে কেউ যদি কখনো কারো নামে দুর্নাম করতো, তবে তিনি সেই ব্যক্তির প্রশংসা শুরু করতেন, যাতে সকলের হুঁশ হয়। সবাই সতর্ক হতে পারে। হজরত কখনো যদি শরীয়তের দৃষ্টিতে কোনো অপছন্দনীয় কাজ করতে দেখতেন, তখন তিনি ইশারায় তাকে বুঝিয়ে দিতেন। কঠোরভাবে কোনো কটু কথা বলতেন না। মহানবী স. এর স্বভাবের মধ্যেও ছিলো এমনি নম্রতা ও স্নেহপরায়ণতা।

তবে উচ্চ তরিকা নকশবন্দিয়ার আদব সংরক্ষণের ব্যাপারে তিনি ছিলেন অত্যন্ত কঠোর। তাঁর দরবারে কোনো সময়ই জিকিরে জেহের হতো না। নিস্তব্ধ দরবারে সবাই জিকিরে খফিতে মশগুল থাকতেন। কখনো বা নিমগ্ন থাকতেন মোরাকাবার মধ্যে।

একবার একজন দরবেশ শব্দ সহকারে 'আল্লাহ্' উচ্চারণ করলেন। এতোটুকুতেই হজরত খাজা অসন্তুষ্ট হয়ে গেলেন। তিনি দরবারের একজন খাদেমকে ডেকে বললেন, তাঁকে বলে দিন, তিনি যদি আমার মজলিশে আসা পছন্দ করেন, তাহলে আমার মজলিশের আদব যেনো তিনি রক্ষা করে চলেন।

হজরতের শরীর ছিলো দুর্বল। তিনি ছিলেন ক্ষীণকায়। কিন্তু তাঁর শীর্ণ দুর্বল শরীর তাঁর এবাদত বন্দেগী সাধনার পথে কখনো কোনো অন্তরায় সৃষ্টি করতে পারতো না। রেয়াজত মুশাক্কাতে তিনি নিজেকে কঠোরভাবে নিয়োজিত রাখতেন।

এশার নামাজের পর তিনি হুজরায় গিয়ে মোরাকাবায় বসতেন। নিজেকে ক্লান্ত মনে হলে অজু করে দুই রাকাত নামাজ পড়ে নিতেন। তারপর আবার মোরাকাবায় বসতেন। এভাবেই এই মহান নকশবন্দি আশেকের তামাম রাত কেটে যেতো।

একবার হজরত খাজার ইচ্ছে হলো, তিনি জামাতে নামাজ পড়বার সময় ইমামের পিছনে নিজে নিজে সুরা ফাতেহা পড়বেন। হজরত ইমাম শাফেয়ী র. এই রকম মত দিয়েছেন। কিন্তু হজরত ইমাম আবু হানিফা র. এর মতে ইমামের পিছনে নামাজ আদায়কারীগণের জন্য সূরা ফাতেহা পাঠ করা নিষেধ।

হজরত খাজা কিছুদিন ইমামের পিছনে সূরা ফাতেহা পড়লেন। হঠাৎ একরাতে তিনি স্বপ্ন দেখলেন, হজরত ইমাম আবু হানিফা র. তশরিফ এনেছেন। তিনি তাঁর নিজের প্রশংসাসূচক একটি কবিতা আবৃত্তি করছিলেন। কবিতায় তাঁর উচ্চ মর্যাদা সম্পর্কে উদাত্ত বর্ণনা ছিলো।

স্বপ্ন ভেঙ্গে গেলো। সেই সুমধুর কবিতা এখনও কানে বাজে। কিন্তু অবিকল তা আর মনে নেই। শুধু মনে আছে তার বিষয়বস্তুঃ অসংখ্য অলিআল্লাহ্ আমার মজহাবের অনুসারী হয়েছেন।

হজরত খাজা তখন থেকেই হজরত ইমাম আবু হানিফা র. এর পূর্ণ অনুসারী হয়ে ইমামের পিছনে সূরা ফাতেহা পড়া ত্যাগ করলেন।

হজরত খাজা ছিলেন দুনিয়া সম্পর্কে একেবারেই উদাসীন। মজলিশে দুনিয়ার কোনো আলোচনা একেবারেই তিনি নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন। নিজের জন্য এবং খানকায় অবস্থানরত দরবেশদের পার্থিব উন্নতির জন্য তিনি মোটেও ফিকির করতেন না। তিনি খানকায় দরবেশের জন্য পছন্দ করতেন উপবাস, অল্পে তুষ্টি, দুনিয়ার প্রতি উদাসীনতা এবং আখেরাতের প্রতি পূর্ণ অনুরাগ।

কোনো ধনী ব্যক্তি খানকার দরবেশদের জন্য কোনো কিছু দিতে চাইলে তিনি নিজের ও তাঁর খাস মুরিদদের জন্য তা গ্রহণ করতেন না। বলতেন, তাঁদের জীবন ধারণ আমারই মতো জোহদ, রেয়াজত, তাওয়াক্কোল এবং কানায়াত দ্বারা সম্পন্ন হবে।

হজরত বলতেন, যদি কারো দ্বারা আমার আর্থিক সাহায্য লাভ হয় তবে মনে কোরো যে, তার সঙ্গে আমার দ্বীনি মহব্বতে ত্রুটি দেখা দিয়েছে। অবশ্য হজরত খাস খাস মুরিদ ছাড়া অন্যদের জন্য আর্থিক সাহায্য গ্রহণ করতেন।

একবার হজরত হজে যাবার এরাদা করলেন। একথা জানতে পেরে বাদশাহ্‌র বিখ্যাত দরবারী খান খানান তাঁর পথ খরচের জন্য এক লাখ টাকা পাঠালেন। হজরত তা গ্রহণ না করে ফিরিয়ে দিলেন। বললেন, অন্যের এতো টাকা নিজের জন্য খরচ করতে মন সায় দেয় না।

পোশাক পরিচ্ছদ এবং খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারেও হজরত ছিলেন অত্যন্ত উদাসীন। যদি দিনের পর দিন তাঁর কোনো অপছন্দনীয় খানাও তাঁর দস্তরখানায় হাজির করা হতো, তবুও তিনি নারাজ হতেন না। আবার কাপড় ময়লা হলেও অন্য কাপড় আনবার জন্য হুকুম করতেন না। যা পেতেন তাই পরতেন। যা পেতেন তাই আহার করতেন। এ ভাবেই তিনি আল্লাহ্‌পাকের রেজামন্দির উপর সন্তুষ্ট থাকতেন।

কিন্তু খানা এন্তেজাম ও পাকানোর ব্যাপারে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সতর্ক। প্রয়োজন হলে পরহেজগার ও মোত্তাকী কোনো ব্যক্তির নিকট থেকে কর্জে হাসানা নিয়ে লঙ্গরখানার ব্যয় নির্বাহ করতেন। তারপর আল্লাহ্‌পাকের তরফ থেকে যখন সাহায্য আসতো তখন সে কর্জ পরিশোধ করে দিতেন।

অজুর সঙ্গে অন্তরের একাগ্রতা নিয়ে জিকিরে রত থেকে খানা পাকাবার জন্য তাঁর কঠোর নির্দেশ ছিলো।

তিনি বলতেন, 'বিনা অজুতে, বিনা হুজুরী দিলে যে খানা পাকানো হয় তা খেলে সে খানা থেকে একপ্রকার ধোঁয়া উঠে ফয়েজ জারী হবার মাকাম এবং স্তরগুলো বন্ধ করে দেয়। পবিত্র রূহ ফয়েজ লাভ করবার অসীলা। কলবী জিকির এবং ফয়েজ লাভের ক্ষেত্রে অবশ্য তা কোনো প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে না।'

একবার এক দরবেশ হজরতের নিকট আরজ করলেন, 'হজরত। আমি নিজের হাল নিস্তেজ ও নিম্নমুখী অনুভব করছি।

হজরত বললেন, 'নিশ্চয় তোমার খাবারের মধ্যে কোনো অসাবধানতা দেখা দিয়েছে।'

দরবেশ আরজ করলেন, 'প্রতিদিন যা খাই আজও তো তাই খেয়েছি।

হজরত বললেন, 'ভালো করে ভেবে দেখুন।

দরবেশ অনেকক্ষণ ভেবে দেখলেন। হঠাৎ তাঁর মনে পড়লো, হজরত ঠিকই বলেছেন, আজ খানা পাকানোর সময় একবার তিনি সামান্য গাফেল হয়ে পড়েছিলেন।

হজরত খাজার মা-ও ছিলেন অত্যন্ত পরহেজগার অলি আল্লাহ্ মহিলা। তিনিও দরবেশদের জন্য নিজ হাতে খাবার পাকাতেন। আল্লাহ্‌পাকের রেজামন্দির উদ্দেশ্যেই তিনি দরবেশদের খেদমত করতে ভালবাসতেন। এখন বৃদ্ধা হয়েছেন। তবু দরবেশদের খেদমত করার ব্যাপারে তাঁর আগ্রহ কমেনি। তিনি নিজ হাতে

রুটি পাকান। বড় বড় ডেগ চুলায় উঠানো নামানোর কাজে সাহায্য করেন। কখনো কখনো এমনো হয় যে, মেহমানদের খাওয়াতে গিয়ে কোনো ভালো খাবার আর অবিশিষ্ট থাকে না। তখন তিনি শুকনো রুটির সামান্য অংশ আহার করেই সন্তুষ্ট থাকেন। তিনি প্রায়ই ছেঁড়া চাটাই এর উপরে শুয়ে থাকতেন।

হজরত খাজা বৃদ্ধা মাতার কষ্টের কথা ভেবে একবার তাঁকে এ সমস্ত মেহেনতের কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য মার কাছে আরজ করেন। তাঁর মা এতে খুব মনোক্ষুণ্ন হন। মনের দুঃখে তিনি কেঁদে ফেলেন। মনে মনে বলেন, জানি না আল্লাহ্‌পাকের দরবারে আমার কি কসুর হয়েছে। যার কারণে আমি তাঁর পেয়ারা বান্দাগণের খেদমত থেকে বঞ্চিত হলাম।

তখন থেকে হজরত খাজা বুঝতে পারলেন, ফল হচ্ছে বিপরীত। আমল এখলাস সব কিছুতেই যেনো পূর্বের সে লজ্জত আর পাওয়া যায় না। তখন তিনি পুনরায় তাঁর মাকে পূর্বের কাজের দায়িত্ব নিতে অনুরোধ জানালেন।

উনিশ

'আল্লাহর ওয়াস্তে যে অবনত হয় আল্লাহ্‌পাক তাঁর মর্যাদা বাড়িয়ে দেন।'

এই হাদিস শরীফ অনুযায়ী আল্লাহ্‌পাক হজরত খাজা বাকী বিল্লাহ র. কে রূহানী জগতে অতি উচ্চ মর্যাদায় সমাসীন করেছিলেন। যেহেতু নিজেকে তিনি সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট মনে করতেন, তাই আল্লাহ্‌পাক তাঁকে জামানার কুতুবের মর্যাদা দান করেছিলেন।

তাঁর নেসবতে অপরিসীম জজবা বিদ্যমান ছিলো। যাঁর প্রতি তিনি মহব্বতের নজরে দৃষ্টিপাত করতেন, তিনিই আল্লাহ্‌র প্রেমে আত্মহারা হয়ে যেতেন।

একবার একজন সিপাহী হজরতের সঙ্গে মোলাকাত করতে আসেন। হজরত তখন অজু করবার জন্য মসজিদের বাইরে আসছিলেন। সৈনিকের খাদেম তখন বাইরে তাঁর ঘোড়ার লাগাম ধরে দাঁড়িয়েছিলো। হজরত খাজা কয়েকবার মহব্বতের নজরে তাঁর দিকে তাকালেন। এরপর যখন তিনি মসজিদে প্রবেশ করলেন তখন সংবাদ পেলেন, খাদেম বেহুঁশ হয়ে মাটিতে পড়ে আছেন।

সবাই বিস্মিত হলেন। দেখলেন, খাদেম সন্ধ্যার পূর্ব থেকে রাত্রি পর্যন্ত মাটিতে কেবল গড়াগড়ি করছে। এরপর চিৎকার করে সে জঙ্গলের দিকে ছুটে গেলো। গেলো তো গেলোই। পরে আর তার কোনো সংবাদই পাওয়া যায়নি।

একবার হজরত খাজা জুমার নামাজ পড়বার জন্য এক মসজিদে হাজির হলেন। খতিব সাহেব খোতবা পাঠ করছিলেন। হঠাৎ তাঁর নজর হজরত খাজার দিকে নিবদ্ধ হলো। হজরতের নূরানী চেহারা দেখা মাত্র তিনি আত্মহারা হয়ে পড়লেন। এরপর চিৎকার করতে করতে তিনি মিম্বর থেকে মাটিতে পড়ে গেলেন।

মীর মোহাম্মদ নোমান র. এর এক শিশুকন্যার জন্য একজন দুধ মা ছিলেন। তিনি একবার শিশু কন্যাকে কোলে নিয়ে হজরত খাজার দরবারে হাজির হলেন। শিশু কন্যাকে দেখেই হজরত খাজা মুগ্ধ হলেন। তিনি শিশুকে কোলে নিয়ে অনেক আদর সোহাগ করলেন। শিশু কন্যা তার কচি হাত দিয়ে হজরতের দাড়ি মোবারক ধরলে একটি দাড়ি তার হাতে উঠে এলো।

হজরত তখন উৎফুল্ল হয়ে এরশাদ করলেন, 'এ শিশু কন্যাটি আমার স্মৃতি রেখে দিতে চায়।'

পবিত্র ও কেশ হতে পেতে চায় পরশ পরাণ,
তার সাথে আরো বুঝি পেতে চায় গভীর আঘ্রাণ।

শিশু কন্যাকে নিয়ে ঘরে ফিরবার পর থেকে সেই দুধমার চেহারায় আজব পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেলো। আল্লাহ্‌র প্রেমে তিনি বেচয়েন হয়ে পড়লেন। আত্মহারা হয়ে চিৎকার করে তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন। সবাই অবাক হয়ে শুনতে পেলো, তাঁর কলব থেকে অদ্ভুত আওয়াজ জারি হয়েছে।

কিছুক্ষণ এভাবে কাটবার পর মহিলার জ্ঞান ফিরে এলো। সবাই তখন একযোগে জিজ্ঞেস করলো, কি হয়েছে তোমার? কি দেখেছো তুমি?

মহিলা জবাব দিলেন, হজরতের দরবার থেকে আসবার পর প্রতি মুহূর্তে আমি তাঁর মোবারক চেহারা দেখতে পেয়েছি। কি অপূর্ব চেহারা। তারপর কি ঘটেছে জানি না। শুধু এটুকু বুঝতে পারি, কলব থেকে কেবলই আল্লাহ্ আল্লাহ্ জিকির হচ্ছে।

মহিলার হাল সম্পর্কে হজরত খাজাকে সংবাদ দেয়া হলো। তিনি তখন মহিলাকে জিকিরের তালিম দিলেন। অল্প দিনের মধ্যেই মহিলা পৌঁছে গেলেন অলি-আল্লাহ্‌র দরজায়।

হজরতের শক্তিশালী তাওয়াজ্জোহ এর বরকতে এরূপ ঘটনা প্রায় ঘটতে লাগলো। তাঁর মোবারক দৃষ্টিপাতে কেউ কেউ জবাই করা মোরগের মতো ছটফট

করেন। কেউবা আত্মহারা হয়ে ছুটে যান লোক চক্ষুর অন্তরালে। কারো সামনে আলমে মেসাল (উপমা জগত) উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। কারো নিকট প্রকাশিত হয়ে পড়ে আলমে আরওয়াহ্ রূহের জগত)। আবার কারো দিল হয়ে ওঠে নূরের আলোকে জ্যোতির্ময়।

বিশ

তিনি ছিলেন ক্ষমার জীবন্ত প্রতীক।

হজরত রসুলেপাক সল্লাল্লহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের অনুসরণের বরকতে তাঁরই মতো স্বভাব আল্লাহ্‌পাক হজরত খাজা বাকী বিল্লাহ্ র.কে দান করেছিলেন।

একবার কয়েকজন সাথী নিয়ে তিনি হজরত কুতুবুদ্দিন বখতিয়ার কাকী র. এর মাজার শরীফ জেয়ারতে গেলেন। মাজার শরীফের খাদেমগণ তাঁর আগমন সংবাদ জানতে পেরে হজরতের বসবার জন্য একটা চাদর বিছিয়ে দিলেন।

সেখানে এক ফকির উপস্থিত ছিলেন। তিনি হজরত খাজাকে সাদর অভ্যর্থনা করতে দেখে হিংসায় জ্বলে উঠলেন। অত্যন্ত কর্কশ স্বরে তিনি হজরতকে নানা কটু কথা বলতে শুরু করলেন এবং নানা প্রকার নিন্দাবাদ করতে লাগলেন।

হজরত খাজা এতে মোটেও রাগান্বিত হলেন না। তাঁর বদনের প্রফুল্লতা তাতে এতোটুকুও ম্লান হলো না। তিনি ফকিরের নিকট গিয়ে মাফ চাইলেন। তারপর বললেন, যা কিছু ঘটেছে তা আমার অজান্তেই ঘটেছে। এর জন্য আমার অনুমতিও নেয়া হয়নি। আপনি আমার সম্পর্কে যা বলছেন, ঠিকই বলছেন। আপনি রাগ করবেন না।

পীরের বিরুদ্ধে এরকম দুর্ব্যবহার দেখে হজরতের সাথীগণ ফকিরকে সাবধান করে দিতে উদ্যত হলেন। কিন্তু হজরত খাজা তাদেরকে চুপ থাকার জন্য নির্দেশ দিলেন। তিনি ফকিরের আরো কাছে এগিয়ে গেলেন। নিজের আস্তিন দিয়ে তাঁর ঘাম মুছে দিলেন। তাঁকে কিছু টাকা দিয়ে অত্যন্ত বিনীতভাবে বললেন, কেনো আপনি আমার সম্পর্কে এরকম বিরূপ ধারণা করছেন। এতে তো আপনারই কষ্ট হচ্ছে। মেহেরবাণী করে আপনার মন মগজকে অহেতুক চিন্তা থেকে মুক্ত রাখুন। আর দয়া করে আমাদেরকে চলে যাবার অনুমতি দিন।

হজরতের স্বভাবের আরো একটি দিক ছিলো। যাকে বলা হয় গয়রত। এই গয়রতও হঠাৎ কখনো কখনো তাঁর স্বভাবে জেগে উঠতো।

চিশতীয়া তরিকার এক বুজর্গের সাহেবজাদা একবার হজরতের নিকট মুরিদ হয়েছিলেন। এরপর তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। অসুখ দিন দিন বেড়েই চলে। বাঁচার তেমন কোনো আশা ছিলো না।

সাহেবজাদার এরূপ মরণাপন্ন অসুখের সংবাদ যখন হজরত খাজার নিকট পৌছানো হলো তখন তিনি বললেন, তার মনে এরকম খেয়ালের উদয় হয়েছিলো যে, নকশবন্দিয়া তরিকা ত্যাগ করে নিজের বুজর্গগণের নেছবত হাসিল করা উচিত। তার সে খেয়াল সম্পর্কে যখনই আমি বুঝতে পারলাম তখন, আমার মনে গয়রত পয়দা হয়েছিলো। এর ফলেই সে অসুস্থ হয়ে পড়ছে।

সাহেবজাদার কাছে হজরতের এই মন্তব্য যখন প্রকাশ করা হলো, তখন তিনি অপরাধ স্বীকার করলেন এবং লজ্জিত হলেন। তারপর তাঁর আগের খেয়াল পরিত্যাগ করে তিনি তওবা করলেন। আশ্চর্যের ব্যাপার। সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর অসুখ ভালো হয়ে গেলো।

একুশ

আশেক মাশুকের প্রেমের বাগান। সে বাগানে ফুল ফুটেছে ও ফল ধরেছে। ক্রমাগত সে বাগোনে নতুন নতুন চারা বপন করে চলেন হজরত খাজা। পানি সিঞ্চন করেন। আগাছা পরিষ্কার করেন। চারা কোনোটা বড় হয়ে উঠেছে। কোনোটায় উঁকি দিয়েছে কচি কিশলয়।

এখানে এই দিল্লীতে এসে তিনি যে বাগান সাজিয়েছিলেন তার অনেক গাছেই এখন কুসুমের সমাবেশ। প্রেমের বাগান হাসে। বাতাসে তার সৌরভ ছড়িয়ে পড়ে।

ইতোমধ্যে অনেকে খেলাফতের মর্যাদা লাভ করেছেন। মীর্জা হুসামুদ্দিন র., শায়েখ আবদুল হক মোহাদ্দেস দেহলবী র., শায়েখ তাজ সম্ভলী র.– আরো অনেকে। হজরত খাজা তাঁদেরকে বিভিন্ন স্থানে নিয়োগ করেছেন। উদ্দেশ্য, যেনো দুর্লভ অমূল্য তরিকার প্রসার হয়। মানুষ যেনো সহজ পদ্ধতিতে মারেফাতের পথে

এগিয়ে আসে। শরীয়তের পাবন্দ হয়। যেনো সবাই মনজিলে মকসুদ পর্যন্ত পৌছাতে পারে।

সম্ভলে গিয়ে শায়েখ তাজ এই উচ্চ তরিকা প্রচারের কাজে নিজেকে নিয়োজিত করলেন। অনেক বাঁধা এলো। সেই সঙ্গে সফলতাও এলো। সম্ভলে এই তরিকা আশাতীতভাবে বিস্তার লাভ করলো।

কিন্তু শায়েখ তাজ সম্ভলী র. শান্তি পান না। কিছু কিছু হিংসুক লোক জোট বেঁধে তার বিরোধিতা করতে লাগলেন। সেখানকার বিখ্যাত বুজর্গ শায়েখ ইলাহী বখশ। তিনি শায়েখ তাজের প্রথম পীর ছিলেন। সেই ইলাহী বখশের এক পাগল মুরিদ ছিলো। নাম তার আবু বকর। বিরোধীগণ পাগল আবু বকরকেই শায়েখ তাজের পেছনে লাগিয়ে দিলো।

এসবের বিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে শায়েখ তাজ হজরত খাজার নিকট পত্র লিখলেন। হজরত খাজা তার জবাব দিলেন। কি সুন্দর জবাব! হজরতের পত্রে যেনো বিমূর্ত হয়ে উঠলো শাশ্বত ফকিরির মূল চেহারা। প্রজ্ঞা, বিচক্ষণতা, ক্ষমা ও উদারতার সে এক অভূতপূর্ব দলিল।

তিনি লিখলেন, আপনি বেচয়েন হয়ে শায়েখ আবু বকর সম্পর্কে যে চিঠি লিখেছেন, তা আমি পড়েছি। কারো সম্পর্কে এ ধরনের আলোচনা করা স্নেহপরায়ণতা, দয়ার্দ্রচিত্ততা এবং শিষ্টাচারের মাকাম ও এলমে মারেফাতের পক্ষে অশোভন ও ক্ষতিকর। এরকম প্রতিকূল অবস্থা থেকে বড় বড় অলিআল্লাহ্ও নিরাপদ ও মুক্ত নন। সুতরাং বেচারা দীওয়ানা (আবু বকর) কিভাবে এসব থেকে নিজেকে বিরত রাখবেন। তিনি তো বাতেন শুদ্ধির জন্য সম্ভবতঃ কয়েকদিনের জন্য তরিকতের পথে কদম রেখেছিলেন। তাই তাঁর খেলাফত প্রাপ্তি ঘটলেও গোনাহ্ প্রকাশে বাধা সৃষ্টি হয়নি। তাছাড়া পাগলরাতো সব সময় বিকৃতবুদ্ধিরই হয়ে থাকে। আপনি নিজেও জানেন, মানবিক সৌহার্দ্য, সংযম, চারিত্রিক দৃঢ়তা পাগলের আচরণে সব সময় অনুপস্থিত থাকে। আল্লাহ্তায়ালাই জানেন যখন কেউ বেলায়েতের মাকামে পৌছান– তখন তিনি অজ্ঞ হলেও জ্ঞানী এবং বেআকল হলেও আকলমন্দ হয়ে পড়েন। কিন্তু পাগল মজ্জুবদের কার্যকলাপ তো স্বাভাবিক হয় না। তারা তো নিজেদের সম্পর্কে এ বিষয়েও বেখবর থাকে যে, শরীয়তের আদেশ নিষেধের সীমারেখা বজায় রাখা এবং শরীয়ত প্রতিপালনে কষ্ট স্বীকার করা জ্ঞান ও আমলের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। মূল কথা হলো এই যে, তাদেরকে সবদিক দিয়ে সম্পূর্ণরূপে অপারগ ধারণা করতে হবে এবং সমস্ত কাজের সমাধানকারী একমাত্র আল্লাহ্তায়ালার প্রতি নিজের দৃষ্টিকে নিবদ্ধ রাখতে হবে।

আল্লাহ্তায়ালার জাতের সাহচর্য এবং তরিকতকে উপলব্ধির গোড়ার কথা হচ্ছে আদব। আর আদবের উদ্দেশ্য হচ্ছে নফস সম্পর্কে সত্যিকারভাবে জ্ঞান অর্জন

করা এবং কু-প্রবৃত্তি থেকে উত্তরণের মাধ্যমে ক্রমাগত উন্নতি সাধন করা। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে তিন রকমের নফস থাকে। নফসে আম্মারা, নফসে লাউয়ামা ও নফসে মোৎমাইন্না। সাধারণ মানুষের মধ্যে নফসে আম্মারা অধিকহারে বিদ্যমান থাকে। কিন্তু আল্লাহ্‌তায়ালার পূর্ণ অনুগত যে নফস সেই নফসে মোৎমাইন্না শুধুমাত্র অলি আল্লাহগণ পরিপূর্ণরূপে হাসিল করে থাকেন। আর নফসে লাউয়ামা মানুষকে কখনো ভালো কাজে আবার কখনো মন্দ কাজে প্ররোচিত করে। সুতরাং নফসে আম্মারার অনুগত লোকেরা প্রকৃতপক্ষে বড় অসহায়। তাদেরকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখা উচিত এবং তাদের ক্ষেত্রে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করে উপযুক্ত সমাধান ও কার্যকর উপদেশ দেওয়া উচিত।

সম্ভলের বাসিন্দাগণের সমালোচনা ও তিরস্কারকে নিজেদের মধ্যে প্রশ্রয় না দিয়ে তাদের সঙ্গে হৃদ্যতা, নম্রতা এবং সহানুভূতির মনোভাব নিয়ে ব্যবহার করতে হবে। তাদের মন থেকে নফসে আম্মারার কু-অভ্যাস ও কুমন্ত্রণা যেনো দূর হয়ে যায় এবং তারা সৎপথে পা বাড়াবার জন্য আগ্রহী হয়ে উঠে। সে জন্য আমাদের নিজেদের আচরণকেও সর্বাগ্রে সংশোধন করতে হবে। যদি কোনো পাগল মজ্জুবীর হালতে কোনো গোনাহ্ করে তবে সম্ভলবাসী তার কার্যকলাপকে কিভাবে শয়তানী চাল বলে মনে করতে পারে?

আলহামদুলিল্লাহ্! আল্লাহ্‌পাকের অজস্র রহমত বর্ষিত হোক। সমালোচনা ও ভর্ৎসনা আউলিয়া কেরামদের তকদীরের নির্ধারণ। এরকম পরিস্থিতি দেখা দিলে আমরা নিজেদের নফসের দিকে দৃষ্টিপাত করবো। নিজের আমল আখলাকের দিকে আমরা সতর্ক দৃষ্টি রাখবো এবং জ্ঞাতসারে না হলেও নিজের অজ্ঞাতে নিশ্চয়ই কোনো গোনাহ্‌র কাজ হয়ে গিয়েছে মনে করে নিজেকে নিকৃষ্ট ও অনুতপ্ত দেখবো এবং আল্লাহ্‌পাকের দরবারে তওবা করবো।

রহমানুর রহিম আল্লাহ্‌তায়ালার মহান দরবারে মিনতি ও আজিজির সঙ্গে নিবেদন করছি, তিনি তাঁর সীমাহীন রহমতের কারণে যেনো দয়া করে আমাদের মধ্য থেকে এই সমস্ত ত্রুটি বিচ্যুতি অপসারিত করে দেন। এখন আপনিই বলুন, সম্বলবাসীদের নিন্দাবাদ ও তিরস্কার দ্বারা আপনার কি লোকসান হতে পারে? তারা কি আপনার ইবাদত কবুল করার মালিক। আপনার পবিত্র তাওয়াজ্জোহ্ নিষ্ক্রিয় করবার ক্ষমতা কি তারা রাখে? অথবা তারা কি আপনাকে আল্লাহ্‌পাকের দরবার থেকে বহিষ্কার করে দিতে সক্ষম?'

একবার এক ব্যক্তি তাঁর এক মুরিদের নিকট একটি পত্র লিখে পাঠালেন। হজরত খাজা ঐ পত্রের অপর পৃষ্ঠায় লিখে পাঠালেন মুক্তার চেয়েও দামী তাঁর অমূল্য নসীহত।

তিনি লিখলেন, 'হায় আফসোস। আল্লাহ্‌তায়ালা যেনো তাঁর মেহেরবানী অনুযায়ী এই অসহায় অন্বেষণকারীকে তাঁর মহব্বত অন্বেষণে সমর্পিতপ্রাণ করেন এবং উদ্দেশ্য সাধনের পথে সকল বাধা অতিক্রম করার ক্ষমতা দান করেন।

আল্লাহ্‌তায়ালার মেহেরবানী সত্ত্বেও নিজেকে দুনিয়ার জীবনে বিদগ্ধ শোকাকুল উন্মাদের মতো মনে হচ্ছিলো। সে তার একমাত্র উদ্দেশ্য আল্লাহ্‌পাকের অন্বেষণে নিজের জীবন কোরবানী করতে উদ্যত হয়েছিলো। তখন আল্লাহ্‌তায়ালা তার অসহায় ও যন্ত্রণাদগ্ধ অন্তরে কারামত প্রদর্শন করেছেন, যাতে তাঁর অসহায় বান্দা দুই জাহানের কাজ কর্মকে মালিকের প্রতি পূর্ণরূপে সোপর্দ করে এবং দুনিয়ার মোহ থেকে পুরোপুরি মুক্ত হয়ে তাঁর নৈকট্য লাভের আশা রাখে। আমিন। ইয়া রব্বুল আলামিন।

আমিও আমার ভাইয়ের জন্য তাই কামনা করি। তিনি যেনো তাঁর নিজের দৃষ্টি সব সময় মাটির দিকে রাখেন। এ ফকির তার নিজের আশা আকাঙ্খা পূরণের জন্য দোয়া চায় না। কারণ একের অসাক্ষাতে তার জন্য অন্যের দোয়াই তীরের মতো আল্লাহ্‌পাকের দরবারে পৌঁছে যায়।

হজরত মাওলানা খাজেগী আমকাংগী র. বলেছেন ঃ-

প্রশংসা কিংবা দুর্নাম যদি আনে সম্মানে প্রভেদ
তবে তাতে ফুটে ওঠে মূর্তি পূজা হেন হীনতার ক্লেদ।

বাইশ

হজরত খাজার মজলিশ যেনো বেহেশতী মজলিশ। সেখানে সারাক্ষণ মিলে নূরের আনাগোনা চলে। ফয়েজের লেনদেন চলে। সে মজলিশ কখনো নীরবতায় মগ্ন। আবার কখনো পবিত্র বাণীর প্রস্রবণ ধারায় উচ্চকিত।

হজরত এরশাদ করেন, 'বড় বড় অলি আল্লাহ্‌গণও দোষ ত্রুটি থেকে সুরক্ষিত নন। যদি তাঁদের কোনো ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়, তবে তাঁদের সমস্ত অবস্থাকে ভ্রান্ত ধারণা করা হবে মূর্খতার পরিচায়ক। এরূপ পরিস্থিতিতে তাঁদের সার্বক্ষণিক হাল কিরূপ ছিলো তা পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন। যদি তাঁদের হাল অধিকাংশ সময়ের জন্য উত্তম হয়, তাহলে তাঁদের সাময়িকভাবে ক্ষণিকের জন্য সংঘটিত অপরাধকে উপেক্ষা করা উচিত। তাঁদেরকে মাজুর মনে করা শ্রেয়ঃ।

তিনি বলেন, 'আল্লাহ্তায়ালার প্রেমের আকর্ষণ বা জজবা এবং একনিষ্ঠ মহব্বতই তাঁর নৈকট্যলাভের একমাত্র পথ। সে আকর্ষণের গতি অন্যদিকে কখনো ধাবিত হয় না। একমাত্র আল্লাহ্তায়ালার দিকেই ধাবিত হয়ে থাকে। কিন্তু অন্যান্য তরিকার ধারা এর বিপরীত। তাঁদের হালের গতি তাঁদেরকে আল্লাহ্পাকের নূরের প্রতি ধাবিত করে। এ কারণেই কেউ কেউ ঐ নূরের মধ্যেই স্থায়ীভাবে অবস্থান করেন। নূরের মালিকের মধ্যে নয়।'

তিনি আরো বলেন, 'প্রত্যেক মানুষেরই হৃদয়ে জজবা বা আল্লাহ্তায়ালার মহব্বতের আকর্ষণ বিদ্যমান। কিন্তু তা সুপ্ত অবস্থায় থাকে। নকশবন্দিয়া মাশায়েখগণ ঐ জজবারই তরবিয়ত করে থাকেন।'

পীরানে কেরাম তিনটি কারণে মানুষের তরবিয়ত ও হেদায়েত করেন। প্রথমতঃ আল্লাহ্তায়ালার এলহাম (বিজ্ঞপ্তি) দ্বিতীয়তঃ পীরের হুকুম। তৃতীয়তঃ পথভ্রষ্ট ও দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের জন্য তাঁদের অন্তরের আকুতি। তাঁরা তখন প্রয়োজন অনুযায়ী শরীয়তের হুকুম আহকাম প্রচারের দায়িত্ব পালন করার জন্য সচেষ্ট হন। ওয়াজ নসিহতের মাধ্যমে মানুষকে শরীয়তের হেফাজত করার আদেশ দেন এবং ফেকাহ্ ও ধর্মীয় কেতাবসমূহের তালিম দেন।' এর ফলে মানুষ তাঁদের শিক্ষার আলোকে আলোকিত হয়ে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে প্রত্যাবর্তন করে।'

'তারা মানুষকে আল্লাহ্তায়ালার নৈকট্য লাভে সাহায্য করেন এবং মহব্বত হাসেলের দরোজা উন্মুক্ত করে দেন। এর জন্য দয়া মেহেরবানি বা স্নেহ প্রদর্শন শর্ত নয় বরং ওয়াসেলের দরজায় পৌঁছে দেওয়াই মূল কথা। এই তরিকা হাসিলের পর আল্লাহ্পাকের প্রতি ঈমানের আকর্ষণ বৃদ্ধির তরবিয়ত দান করা হয়। কারণ নবী আ.গণ এই পথেরই দাওয়াত দিয়েছেন।'

তিনি বলতেন, 'কেতয়ে আলায়েকের' সংজ্ঞা হচ্ছে, দুনিয়া ও আখেরাতের সমস্ত নেয়ামত থেকে হৃদয় যেনো তার যাবতীয় আকর্ষণকে ত্যাগ করতে পারে। সমস্ত প্রকার অবস্থা এবং সৌন্দর্যের অবলোকন থেকে যেনো মুক্তি লাভ করে। দুঃখের দিনের পেরেশানী এবং সুখের দিনের আনন্দ– সবকিছুর উপর বিজয় লাভ করতে পারে। হৃদয়ের অবস্থা যেন সব অবস্থায় সমান্তরাল থাকে- একেই বলা হয় 'কেতয়ে আলায়েক' (সমস্ত কিছুর সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ)।'

হজরত প্রায়ই বলতেন, 'জীবিকা অর্জনের সমস্ত উপায় ত্যাগ করে শুধুমাত্র আল্লাহ্তায়ালার উপরে ভরসা রেখে নিশ্চুপ বসে থাকার নাম তাওয়াক্কোল নয়। এরকম ধারণা সরাসরি বে-আদবির সামিল। বরং কেতাবত ইত্যাদিকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করা উচিত। তবে পেশা বা জীবিকা অর্জনের জন্য অবলম্বনের প্রতি নজর রাখা উচিত নয়। জীবিকা অর্জনের অবলম্বনকে ঘরের দরোজার মতো মনে করতে হবে। কারণ আল্লাহ্পাক মানুষের আয় রোজগারের জন্য বহু অবলম্বন

(আসবাব) নির্ধারিত করে দিয়েছেন। কেউ যদি ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে ঘরের দেয়াল ডিঙ্গিয়ে যাতায়াত করতে চায় তবে অবশ্যই তা বে-আদবী হবে।

হজরত খাজা বাকী বিল্লাহ র. বলতেন, 'যে ব্যক্তি নাফরমানী এবং গোনাহ্র কাজে লিপ্ত, যার দিলে পার্থিব মোহ প্রবলভাবে বিদ্যমান, দুনিয়া অর্জনের উপকরণের সঙ্গে যে নিজেকে জড়িয়ে রেখেছে অথবা যে জরুরী জীবিকার্জনের পথে অমনোযোগী, যে ব্যক্তি মানুষের সঙ্গে অপ্রয়োজনীয় সম্পর্ক রাখে, যার অন্তর গায়রুল্লাহ্র আকর্ষণ থেকে মুক্ত নয়, যে ব্যক্তি মোজাহেদা থেকে বিমুখ, যার নির্ভরতা নিজের কার্যাবলী এবং শক্তি সামর্থ্যের উপর, আজলী আহকামসমূহের নিকট আত্মসমর্পণ যার নসীব হয়নি– সে ব্যক্তি নাকেছ। নিশ্চয়ই সেই ব্যক্তি নাকেছ (ত্রুটিপূর্ণ)। তবে একথাও জেনে রাখা দরকার যে, এমন অনেক লোক আছেন যাঁরা আমিত্ব এবং নফসের কামনা বাসনার সীমা অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁরা অল্পে তুষ্টি ও নির্জনতা এখতেয়ার করেছেন। কঠোর সাধনা না করেও তাঁরা অলি আল্লাহ্গণের মর্যাদার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত উপনীত হতে পেরেছেন। তাঁদের দৃষ্টি যেদিকেই পড়ুক না কেনো সেদিকে একমাত্র আল্লাহ্তায়ালার ফজল (অনুগ্রহ) ছাড়া আর কিছুই নজরে আসে না।'

হজরত এরশাদ করতেন, 'যদি কেউ এ তরিকার কোনো হক দরবেশের মহব্বতের শিকলে এমনভাবে নিজেকে বেঁধে ফেলতে সক্ষম হন যে, তাঁর অনুপস্থিতিতেও তাঁর মোবারক চেহারার উপস্থিতি অনুভূত হয়– তাহলে সেই ব্যক্তির রাবেতা এখতেয়ার করা উচিত। এ রকম অবস্থায় সালেককে সতর্ক থাকতে হবে, যেনো তাঁর দ্বারা এমন কোনো কথা বা কাজ না হয় যা দরবেশের মনে বিরক্তি উৎপাদনে সহায়তা করতে পারে। এ অবস্থায় নিজের সমস্ত আশা আকাঙ্খাকে মোর্শেদের (দরবেশের) আশা আকাঙ্খার পূর্ণ অনুগত করতে হবে। তিনি যেভাবে পরিচালনা করেন সেভাবেই পরিচালিত হতে হবে। কারণ, শায়েখ এবং মুরিদের পারস্পারিক সম্পর্কের উপরেই এ তরিকার মূল ভিত্তি বিদ্যমান।'

'তুলা যেমন কাঁচের উপরের প্রতিফলিত সূর্যরশ্মি থেকে সূর্যের উত্তাপ সংগ্রহ করে থাকে, তেমনি পারস্পারিক মজবুত সম্পর্কের কারণে মুরিদ তাঁর মোর্শেদের দিলের উত্তাপ থেকে হক সোবহানাল্লাহু তায়ালার মহব্বতের উত্তাপ হাসিল করে থাকেন। তরিকতে পীর ও মুরিদের উদাহরণ সূর্যরশ্মি প্রতিফলিত কাঁচ এবং তুলার মতোই। মূলতঃ এই তরিকা হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. এর তরিকা। তিনি হজরত রসুলেপাক স. এর জাতের সঙ্গে পরিপূর্ণ নেসবত হাসিল করেছিলেন এবং সেই সূত্র থেকেই ফয়েজ লাভ করেছিলেন। যেহেতু নকশবন্দিয়া তরিকা হজরত সিদ্দিকে আকবর রা. এর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, সেই কারণে এই তরিকা মহব্বতের তরিকা। যাকে নেসবতে হুব্বি বলা হয়।'

তিনি বলেন, 'দাওয়ামে মোরাকাবা অত্যন্ত উচ্চ সম্পদ। এর দ্বারা হৃদয়ে আল্লাহ্‌তায়ারার মারেফাতের নূর হাসিলের ক্ষমতা সৃষ্টি হয় এবং এরকম হওয়া আল্লাহ্‌পাকের কবুলিয়তের নিদর্শন।'

তেইশ

হজরত খাজা বাকী বিল্লাহ র. এর মহফিল জান্নাতী মহফিল। নুরের খনি। এখান থেকে এলমে মারেফাতের বিভিন্নমুখী নহর নির্গত হয়। সে নহরের মন্দাকিনী ধারা কানায় কানায় ভরিয়ে দেয় তালেবে মাওলাগণের হৃদয়ের পিপাসিত আধার। আধারের যেনো কোনো সীমা পরিসীমা নেই। যতো পানি পান করা যায় ততোই বেড়ে যায় তৃষ্ণার আকাঙ্খা। আরো চাই-আরো। এ অনন্ত তৃষ্ণার পথে অন্তহীন ধারার প্রবাহ– সেই বেগবান প্রবাহের গতিতে প্লাবিত হয় এই খানকা, নূরের পর নূরের নহর বয়ে চলে এখানে। তাপিত তৃষিত বুকের ঈপ্সিত আকাঙ্খা এই জান্নাতি প্রেমের অঙ্গনে কখনো নীরবে, কখনো সরবে পরিপূর্ণ হয়ে উঠে।

হজরত খাজা বাকী বিল্লাহ র. বলতেন, 'নকশবন্দিয়া তরিকার বুজর্গানে দ্বীন র. এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তির বুকে এই প্রেমের শামাদান জ্বলে, বিশুদ্ধ মনে তার তওবা করা উচিত। তারপর নিজের শক্তি অনুসারে রেয়াজত, জোহদ, তাওয়াক্কোল, কানায়াত, ইজলত, সবর, তাওয়াজ্জোহ্ প্রভৃতি মাকামের প্রতি দৃষ্টি রেখে সারাক্ষণ আল্লাহ্‌তায়ালার জিকিরে নিজেকে নিয়োজিত রাখতে হবে। একেই বলে সফর দর ওয়াতন।'

'বেলায়েত দুই ধরনের। প্রথমটির নাম বেলায়েত বিল ফাতাহ। বন্দেগীতে হক সোবহানাল্লহু তায়ালার নৈকট্য লাভকেই বেলায়েত বিল ফাতাহ্ বলা হয়। দ্বিতীয়টির নাম, বেলায়েত বিল কসর। এই ধরনের অলিগণ দ্বারা তাসাররুফাত, কাশফ ও কারামত অত্যধিক পরিমাণে প্রকাশিত হয়। ফলে তাঁরা মানুষের নিকট খুব বেশী পরিচিত ও গ্রহণীয় হন।'

তালেবে মাওলাগণ যে ফায়দা লাভ করে থাকেন তা বেলায়েত বিল ফাতাহ্ সম্পর্কিত বিষয়। যখন তালেবে মাওলা তার দিলের আয়না পীরের দিলের

আয়নার দিকে রুজু করেন তখন তার যোগ্যতা অনুসারে পীরের আয়নার আকস (প্রতিচ্ছবি) তালেবে মাওলার আয়নায় প্রতিফলিত হয়।

উল্লিখিত বেলায়েত দু'টির মধ্যে কারো কারো একটি বেলায়েত হাসিল হয়। আবার কেউ কেউ উভয় প্রকার বেলায়েত হাসিল করতে সক্ষম হন। তবে দু'টি বেলায়েত হাসিলকারীগণের মধ্যে একটি বেলায়েত সবল এবং অন্যটি দুর্বল হয়। নকশবন্দিয়া তরিকার মাশায়েখ ও পীরানে কেরামগণের মধ্যে সব সময়ই বেলায়েত বিল ফাতাহ্ প্রবল অবস্থায় এবং বেলায়েত বিল কসর সুপ্ত অবস্থায় বিদ্যমান থাকে। যখন কোনো অলিআল্লাহ্ দুনিয়া ত্যাগ করে আখেরাতে সফর করেন, তখন বেলায়েত বিল কসর তাঁর উপযুক্ত সাথীদের জন্য রেখে যান এবং বেলায়েত বিল ফাতাহ নিজের সঙ্গে নিয়ে যান।

'ইয়াদ করদ' অর্থ জবানের দ্বারা স্মরণ করা।

'বাজগাশত্' এর অর্থ এলাহী তুমিই আমার মকছুদ।

'নিগাহ্ দাশত্' এর মানে, খারাবি এবং কুমন্ত্রণা থেকে অন্তরকে মুক্ত রাখা।

'ইয়াদ দাশত্' অর্থ দিলের দৃষ্টি সব সময় আল্লাহ্‌তায়ালার প্রতি নিবদ্ধ আছে কিনা সে সম্পর্কে সচেতন ও সর্তক থাকা।

'তওবা' এর অর্থ গোনাহ্ থেকে মুক্তি লাভ করা বা গোনাহ্ থেকে বের হয়ে আসা অর্থাৎ গোনাহ্ থেকে পরিত্রাণ প্রাপ্তি। এর মাঝে যদি সূক্ষ্ম হেজাবও (পর্দা) থাকে তবে তাও গোনাহ্। পূর্ণ তওবার অর্থ নিজেকে কলুষতামুক্ত করে আল্লাহ্‌পাকের নূরে নিজেকে সমুজ্জ্বল করে তোলা। আর এর জন্য আল্লাহ্‌তায়ালার সঙ্গে যোগাযোগ এবং সংযোগ স্থাপন করা একান্ত জরুরী।

জোহদ এর অর্থ কামনা বাসনা থেকে নিষ্কৃতি লাভ। কারণ কামনা বাসনার অধীন হওয়া মানেই দুনিয়ার ধন সম্পদের মধ্যে নিজেকে বন্দী করে রাখা। না মর্দমীর নামই পূর্ণ জোহদ।

যখনই নিশ্চিহ্ন হয় দুনিয়ার মোহ
তখনই সমাপ্ত হয় মাশুক বিরহ।

'তাওয়াক্কোল' অর্থ আসবাবপত্র বা সাজ সরঞ্জামের উপস্থিতি অনুপস্থিতির খেয়াল থেকে মুক্ত থাকা। এমনকি তাদের অস্তিত্বের অনুভূতি থেকে সম্পূর্ণরূপে নিষ্কৃতি লাভ করাকে কামালে তাওয়াক্কোল বলে। কামালে তাওয়াক্কোল শূহুদে হক এর একটি শাখা।

'কানায়াত' এর অর্থ ন্যূনতম প্রয়োজন মিটে গেলেই তৃপ্ত হওয়া এবং বাড়তি জিনিস পরিত্যাগ করা। ভালো আহার, ভালো লেবাস, পোশাক, সুন্দর ঘর বাড়ীর মোহ থেকে অন্তরকে মুক্ত রাখার নামই কানায়াত। কেবলমাত্র হক তায়ালার হাস্তি ও প্রেমের উপর নির্ভরতা ও শান্তি প্রাপ্তিই কানায়াত।

'উয্লত্' এর অর্থ মানুষের সঙ্গে মেলামেশা পরিত্যাগ এবং নির্জনতা অবলম্বন। বাহ্যিক নির্জনতা এখতেয়ারের সঙ্গে সঙ্গে মনকে সমস্ত বস্তুর ফিকির থেকে মুক্ত রাখার নাম 'কামালে উয্লত্।'

'জিকির' এর অর্থ আল্লাহ্তায়ালা ছাড়া গায়রুল্লাহর স্মরণ থেকে দিলকে মুক্ত রাখা। আর কামালে জিকিরের অবস্থা এই রকম যে, নিজের জিকিরের খেয়ালও থাকবে না। এ অবস্থায় মজকুর (আল্লাহ্তায়ালা) স্বয়ং জিকিরকারীকে স্মরণ করেন।

'তাওয়াজ্জোহ্' এর অর্থ দুনিয়ার সমস্ত বস্তু ও খাহেশাত পরিত্যাগ করে একমাত্র আল্লাহ্তায়ালার খেয়ালে পরিপূর্ণরূপে নিজেকে লিপ্ত রাখা।

'সবর' এর অর্থ নফসের কাম্য বস্তু, জৈবিক কামনা এবং আকর্ষণীয় আসবাবসমূহ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখা।

'মোরাকাবা' এর অর্থ দুনিয়ার সমস্ত কাজ, খেয়াল এবং কুমন্ত্রণা থেকে নিজেকে ফিরিয়ে রেখে চোখ বন্ধ করে নীরবে আল্লাহ্তায়ালার ফয়েজের প্রতীক্ষায় বসে থাকা।

'রেজা ও তসলীম' এর অর্থ নফসের সন্তুষ্টি সাধনের ইচ্ছা পরিত্যাগ করা। আল্লাহ্তায়ালার সন্তুষ্টিকেই নিজের সন্তুষ্টি বলে মনে করা। আর তকদীরের আহকামকে মেনে নিয়ে নিজেকে আল্লাহ্তায়ালার নিকট পূর্ণরূপে সোপর্দ করা।

'কাশফে কুবুর' এর কোনো গুরুত্ব নেই। কোনো অলি আল্লাহ্র মাজার জেয়ারতের সময় মোরাকাবার হালতে কবরের সুরত দর্শন করাকেই কাশফে কবুর বলা হয়। এ সমস্ত সুরতি কাশফ অত্যন্ত ভুল ত্রুটি পূর্ণ এবং পদস্খলনের নিমিত্ত হয়ে থাকে। মোদ্দাকথা, শুধুমাত্র আল্লাহ্পাকের সান্নিধ্য এবং মহব্বত লাভের চেষ্টায় সব সময় নিজেকে নিয়োজিত রাখা আমাদের সকলেরই একান্ত কর্তব্য।

চব্বিশ

সেরহিন্দ।

সেই সেরহিন্দ। নূরে ভরা সেরহিন্দ, যেখানে সেই বিখ্যাত ফারুকী পরিবারের আবাস। যে পরিবারের বিখ্যাত সন্তান হজরত ইমাম রফিউদ্দিন র. এই শহরের

ভিত্তি স্থাপন করে স্থায়ী আবাস গড়েছিলেন। যে শহরের ভিত্তি স্থাপন করার সময় তাঁর সঙ্গী ছিলেন বিখ্যাত অলি আল্লাহ্ হজরত শাহ্ বু' আলী কলন্দর র.।

তারপর চারপুরুষ গত হয়েছে।

ইমাম রফিউদ্দিন র. এর পর তাঁর পুত্র শায়েখ হাবীবুল্লাহ্ র.। তাঁর পুত্র শায়েখ আবদুল হাই র.। তাঁর পুত্র শায়েখ জয়নুল আবেদীন র.। তারপর শায়েখ আবদুল আহাদ র.।

শায়েখ আবদুল আহাদ র. বিভিন্ন প্রকার কামালতের অধিকারী ছিলেন। এই বুজর্গের অনুসন্ধিৎসার শেষ ছিলো না। কতো জায়গা তিনি সফর করেছেন। কতো জ্ঞান আহরণ করেছেন। পূর্ব পুরুষগণের ঐতিহ্য অনুযায়ী তিনিও হাসিল করেছেন এলমে মারেফাতের দুর্লভ সম্পদ। একে একে লাভ করেছেন কাদেরিয়া, চিশতীয়া, সোহরাওয়ার্দিয়া তরিকার কামালত ও খেলাফত। শুধুমাত্র নকশবন্দিয়া তরিকা বাকী। কিন্তু উপায় নেই। এদেশে এই হিন্দুস্তানে নকশবন্দিয়া তরিকার কোনো বুজর্গ নেই। তাই তাঁর সে আশা পূরণ হবার নয়।

এই ব্যাপারে প্রায় সময়ই তিনি আফসোস করতেন। সুযোগ্য পুত্র শায়েখ আহমদের কাছে এরশাদ করতেন, নকশবন্দিয়া তরিকা এক অনন্য তরিকা। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মারেফাত ও খাস বরকতে পরিপূর্ণ এই উচ্চ তরিকা। এই তরিকার নেসবত হজরত সিদ্দিকে আকবর রা. এর বুক থেকে জারি হয়ে নকশবন্দিয়া বুজর্গগণের বুকে বুকে চলে আসছে।

পিতার কথা শুনে পুত্র শায়েখ আহমদ র. এর অন্তরে অনুসন্ধিৎসা জাগে। কি আছে সেই তরিকায়– সেই উচ্চ নকশবন্দিয়া তরিকায়। সেই নিসবতের অধিকারী এমন কারো সঙ্গে কি কখনো তাঁর সাক্ষাৎ লাভের সৌভাগ্য হবে? কে জানে কোনোদিন সে সুযোগ হবে কিনা।

সময় বয়ে যায়। সেরহিন্দের উজ্জ্বল প্রদীপ শায়েখ আবদুল আহাদ র. বুঝতে পারেন প্রদীপের তেল ফুরিয়ে আসছে। আরো ক্রমশঃ কমে আসছে। নিভু নিভু এই প্রদীপের আলো এবার নিভে যাবে।

শায়েখ আবদুল আহাদ র. রোগে শয্যাশায়ী হলেন। এবার শেষ সফরের আয়োজন। সে জন্য তাঁর কোনো আফসোস নেই। নিজের জীবনে তিনি যা কিছু সঞ্চয় করেছেন, সুযোগ্য সন্তান শায়েখ আহমদ র. তার সব কিছুই হাসিল করেছেন। তাই আর কোনো আফসোস নেই। মাশুকের ডাক এসেছে। সেই ডাকে সাড়া দিয়ে এবার তিনি আখেরী সফরের জন্য প্রস্তুত হলেন।

শায়েখ আবদুল আহাদ র. কয়েকবার বললেন, 'সেই কথাই মূল কথা যা আমার পীর হজরত আবদুল কুদ্দস গাঙ্গুহী র. এরশাদ করেছেন।'

শায়েখ আহমদ র. পাশেই ছিলেন। তিনি প্রশ্ন করলেন, 'হুজুর কি সে কথা?'

তিনি বললেন, ‘প্রকৃত পক্ষে হক সোবহানাহু তায়ালাই নিছক অস্তিত্ব। কিন্তু তিনি জগতের আবরণ তার বান্দাগণের সামনে ঝুলিয়ে দিয়েছেন। এভাবেই তাদেরকে দূরে রেখেছেন।’

শায়েখ আহমদ র. আরজ করলেন, ‘মেহেরবানি করে আমাকে অসিয়ত করুন।’

তিনি বললেন,‘এইটুকুই অসিয়ত। এখন আমি আহলে বায়েতের মহব্বতে নিমজ্জিত আছি। নেয়ামতের বিশাল দরিয়ায় আমি হাবুডুবু খাচ্ছি।’

এলাহী বহক্কে বনি ফাতেমা,
কি বার কওলে ইমা কুনি খাতেমা।
বনি ফাতেমার বরকতে ইয়া এলাহী।
তোমার কাছে ঈমানে খাতেমা চাহি।

শায়েখ আবদুল আহাদ র. চলে গেলেন। দীর্ঘ আশি বছর দুনিয়ার আলো বাতাস গায়ে মেখে সময় কাটিয়েছেন। এই সেরহিন্দ। জন্মভূমি এই সেরহিন্দের সঙ্গে কত মমতা, কত মধুর স্মৃতি জড়িয়ে আছে। সবকিছু ছিন্ন করে তিনি চলে গেলেন। সেদিন ছিলো এক হাজার সাত হিজরীর সতেরই রজব। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রজিউন।

পঁচিশ

সারা পরিবারে শোক ছায়া ফেলেছে। শায়েখ আহমদ র. এর অন্তরে পিতৃবিয়োগের তাজা ক্ষত। তবুও তিনি নীরব। তাইতো হবে, যা আল্লাহ্পাক ইচ্ছা করেন। আল্লাহ্পাকের ইচ্ছার উপর তিনি নিজেকে সমর্পণ করেন এবং সবর করেন। পৃথিবী এরকমই। জীবন আসে এবং জীবন চলে যায়। শোক আসে আবার চলে যায়। কিছুই এখানে থেমে থাকে না। অবিরাম গতিতে সবকিছু এগিয়ে চলে।

দীর্ঘ দিনের সেই পুরানো ইচ্ছেটা শায়েখ আহমদ র. এর অন্তরে আবার জেগে উঠলো। ক্রমাগত তা অন্তরকে আলোড়িত করতে লাগলো। বায়তুল্লাহ্ জেয়ারতের বাসনা তাঁর কতো দিনের একান্ত বাসনা।

এতোদিন বৃদ্ধ পিতা ও পীর হজরত শায়েখ আবদুল আহাদ র. এর খেদমতের অসুবিধার কথা চিন্তা করেই সে বাসনা তাঁকে অন্তরেই চেপে রাখতে হয়েছে।

এখন আর কোনো বাধা নেই। এবার সফরে যেতে হবে। সেই কাবা- সেই রওজায়ে নববী স.।

সামান প্রস্তুত হলো। শায়েখ আহমদ রওয়ানা হলেন। চোখে কাবার নেশা, অন্তরে মদীনার হাতছানি। তিনি আর নিজেকে ধরে রাখতে পারেন না।

শায়েখ আহমদ দিল্লী এলেন। সেখানে অন্তরঙ্গ বন্ধু মাওলানা হাসান কাশমিরী র. এর আতিথেয়তা গ্রহণ করলেন।

মাওলানা সাহেব জানালেন, দিল্লীতে একজন নকশবন্দিয়া তরিকার বুজর্গ তশরীফ এনেছেন। তিনি নকশবন্দিয়া তরিকার এক দুর্লভ রত্ন। এক বিরল ব্যক্তিত্বের অধিকারী তিনি। তাঁর সোহবত ফয়েজ ও বরকতে পরিপূর্ণ। দীর্ঘদিন রেয়াজত ও চিল্লাকাশি করেও যা হাসিল করা যায় না– তাঁর এক তাওয়াজ্জোহের বরকতেই তা হাসিল হয়ে যায়।

শায়েখ আহমদ সবকিছু তাজ্জব হয়ে শুনলেন। তাঁর মনে পড়ে গেলো মরহুম পিতার কথা। নকশবন্দিয়া তরিকার জ্ঞান অর্জনের জন্য তাঁর যে আগ্রহ ও ব্যাকুলতা ছিলো সেই সব স্মৃতি কথা।

মাওলানা সাহেবের কথা শুনে শায়েখ আহমদের অন্তরও ব্যাকুল হয়ে উঠলো। কে এই বুজর্গ? তাঁর সঙ্গে মোলাকাতের জন্য তিনি ভিতরে ভিতরে অস্থির হয়ে উঠলেন।

শায়েখ আহমদ হজরত খাজা বাকী বিল্লাহ্ র. এর দরবারে হাজির হয়ে বিস্মিত হলেন। এই ক্ষীণকায় দুর্বল বুজর্গ জ্বলন্ত অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মতো– দীপ্ত তরবারির মতো। আল্লাহ্পাকের নিকট থেকে আগত তিনি যেনো এক বিরাট সৌভাগ্যের নিদর্শন।

হজরত খাজা র.ও দৃষ্টিপাত করলেন শায়েখ আহমদের দিকে। নিমেষে তাঁর অন্তর চমকে উঠলো। মন বলে উঠলো, এইতো সেই- সেই তোতাপাখি। তোতাপাখি আজ নিজে এসে ধরা দিয়েছে। দীর্ঘ প্রতীক্ষার প্রহর এবার বুঝি শেষ হলো। পাখি। হে অন্তরের তোতাপাখি। বলো কোথায় তোমাকে রাখি। তুমি কি জানো তোমার জন্যই আমার এই দীর্ঘ সফর। তোমার জন্যই রাতদিন ধরে পথ চেয়ে আছি। তুমি কে তা কি তুমি জানো? তুমিতো সেই ভাগ্যবান– যার জন্য সমস্ত উম্মতে মোহাম্মদী সল্লাল্লহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম পথ চেয়ে আছে। তুমিতো সেই বুলন্দ নসীব, নেসবতে সিদ্দিকীর আমানত যাঁর বুকে সোপর্দ করা হবে। তুমিতো এই মহান নকশবন্দিয়া তরিকার খাস ওয়ারিস। হজরত রসুলেপাক স. এর নির্বাচিত প্রতিনিধি।

হজরত খাজা র. এরশাদ করলেন, 'আপনি আমার খানকায় কিছুদিন অবস্থান করুন।'

শায়েখ আহমদ হজরত খাজার খানকায় এক সপ্তাহ থাকবার ওয়াদা করলেন। এতো সেই দরবার, যে দরবারে শায়েখ আহমদের স্থায়ী অধিকার সংরক্ষিত হয়ে আছে। এ খানকা তো এক সপ্তাহের নয়, এক মাসের নয়, এক বছরের নয়– এ খানকার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক যে সারা জীবনের।

দুদিন যেতে না যেতেই শায়েখ আহমদের হাল দ্রুত পরিবর্তিত হতে থাকলো। হজরত খাজা র. এর জজবা তাঁর উপরে প্রবল প্রভাব বিস্তার করেছে। তরিকা গ্রহণের ইচ্ছায় তাঁর সমস্ত অস্তিত্ব আকুল হয়ে উঠেছে। তিনি হজরত খাজা র. এর নিকট বায়াত গ্রহণ করবার আবেদন জানালেন।

কাউকে বায়াত করাবার আগে ইস্তেখারা করা ছিলো হজরত খাজার অভ্যাস। কিন্তু এক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম ঘটলো। শায়েখ আহমদকে তিনি এস্তেখারা না করিয়ে একান্ত নিভৃতে ডেকে নিয়ে গেলেন। সেখানে মুরিদ হিসাবে তাঁকে কবুল করলেন এবং কলবের জিকিরের তালিম দিলেন।

সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর কলব নকশবন্দি নূরে পরিপূর্ণ হয়ে উঠলো। অপূর্ব এর আস্বাদ। এ লজ্জত অবর্ণনীয়।

সপ্তাহ শেষ হয়ে এসেছে। কিন্তু যাবার উপায় নেই। এই দরবার ছেড়ে, প্রেমের এই অবিস্মরণীয় মহফিল ছেড়ে যেতে তাঁর মন চায় না।

শেষ পর্যন্ত তাই শায়েখ আহমদ আর যেতে পারলেন না। তাঁর তালিম চলতে লাগলো। বিস্ময়কর গতিতে তিনি রুহানী মনজিলসমূহ অতিক্রম করতে লাগলেন।

একদিন ফানা অবস্থায় তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠলো এক বিশাল সমুদ্র। এ সমুদ্রের ছায়ার মধ্যে বিশ্বের বিভিন্ন প্রকার আকৃতি ভেসে উঠলো। এই হাল ক্রমেই বাড়তে লাগলো। কোনো সময় এক প্রহর, কখনো দুই প্রহর, আবার কখনো সমস্ত রাত ধরে এই হাল স্থায়ী হতে লাগলো।

শায়েখ আহমদ হজরত খাজার নিকট তাঁর হাল সম্পর্কে বর্ণনা করলেন।

হজরত খাজা এরশাদ করলেন, আপনার এক ধরনের ফানা হাসিল হয়েছে।

এরপর বললেন, 'এবার জিকির বন্ধ রাখুন। শুধু জিকিরের প্রতি খেয়াল রাখুন।'

দুই দিন কেটে গেলো। এবার শায়েখ আহমদ লাভ করলেন ফানায়ে মোছতালেহ্ (প্রচলিত ফানা)।

এই হাল যখন তিনি হজরত খাজা র. এর নিকট প্রকাশ করলেন, তখন হজরত খাজা এরশাদ করলেন, 'তামাম আলম কি আপনার দৃষ্টিতে একক এবং সংলগ্ন বলে মনে হচ্ছে?'

শায়েখ আহমদ র. বললেন, 'হাঁ। তাই দেখছি।'

হজরত খাজা র. এরশাদ করলেন, 'এর নাম ফানাফিল ফানা। কারণ, শরীরের সঙ্গে সংযুক্ত থাকা সত্ত্বেও এই ফানা হাসিল হয়।'

সমস্ত রাত এই হালেই কাটলো। পরদিন শায়েখ আহমদ আরজ করলেন, 'আমি হক সোবহানাহু তায়ালার সম্পর্কের হুজুরী অনুভব করছি।'

এর পর আর এক হাল প্রকাশিত হলো। শায়েখ আহমদ র. দেখলেন, একটি কালোবর্ণের নূর প্রকাশিত হয়েছে। ঐ নূর সমস্ত জগতকে ঘিরে রয়েছে। এই হালও তিনি হজরত খাজার নিকট পেশ করলেন।

হজরত খাজা তখন বললেন, 'ঐ কালো নূরের বিস্তৃতিই এলমে এলাহী। ঐ কালো নূর জাত পাকের সম্পর্কের মাধ্যমে জাগতিক দ্রব্য সামগ্রীর সঙ্গে বিস্তৃত হয়ে আছে। ঐ বিস্তৃতিকে নফি করতে হবে। তারপর হয়রানীতে আসতে হবে।'

শায়েখ আহমদ র. তাই করলেন। বিন্দু বিলুপ্ত হলো। হয়রানিও দেখা দিলো। এখানে তৌহিদে শুহুদি নসিব হয়। কারণ এই মাকামে হক সোবহানাহু তায়ালা নিজেই নিজেকে দেখেন।

শায়েখ আহমদ নিজের এই হালের কথা মোর্শেদের নিকট বয়ান করলেন। সব শুনে হজরত খাজা র. বললেন, এর নাম নকশবন্দিয়া হুজুরী। নকশবন্দি বুজর্গগণ একেই হুজুরে আগাহী বা হুজুরে বেগাইবত বলেন। এই মাকামই 'প্রারম্ভে শেষ বস্তু প্রবিষ্টকরণ' এর মাকাম। এই তরিকার মাধ্যমে এরূপ অবস্থা অতি সহজেই লাভ হয়ে থাকে। কিন্তু অন্য তরিকার মাধ্যমে এরূপ অবস্থায় পৌঁছতে দীর্ঘদিন ধরে কঠোর সাধনা করতে হয়।

শায়েখ আহমদের হাল পুনরায় পরিবর্তিত হতে লাগলো। পুনরায় ফানা শুরু হলো। এবার কলব এতো বেশী প্রশস্ততা লাভ করলো যে, সমস্ত সৃষ্টি, আরশ থেকে ফরশ পর্যন্ত সরিষার দানার মতো মনে হলো। তিনি দেখলেন, তিনি নিজে এবং জগতের প্রতিটি বিন্দু হক। এরপর দেখলেন, প্রত্যেক অণু পরমাণু তাঁর প্রতিবিম্ব ধারণ করেছে এবং তিনি নিজেও সবকিছুর প্রতিচ্ছবি ধারণ করেছেন।

এ অবস্থা কেটে গেলে তিনি আবার দেখলেন, তাঁর নিজের অস্তিত্বের প্রতিটি বিন্দু এতো বেশী প্রশস্ততা লাভ করেছে যে, শুধু একটি বিশ্ব নয় কয়েকটি বিশ্ব এর মধ্যে অবস্থান করতে পারে। এ এমন বিস্তৃত নূর যা অণু-পরমাণুতে অনুপ্রবেশ করেছে এবং বিশ্বের আকৃতিসমূহ এই নূরের মধ্যে বিলীন হয়ে গিয়েছে। এরপর তিনি অনুভব করলেন, তিনি নিজে এবং প্রতিটি অস্তিত্বের অণু-পরমাণু সারা বিশ্বের শক্তির আধারে পরিণত হয়েছে।

হজরত খাজা বাকী বিল্লাহ্ র. এই হাল শুনে এরশাদ করলেন, 'এ অবস্থার নাম তওহীদে হক্কুল ইয়াকিন। যাকে বলা হয় জময়ুল জমআ।' আবার হালের

পরিবর্তন হতে লাগলো। শায়েখ আহমদ র. এবার দেখলেন, বিশ্বের আকৃতিসমূহ যা পূর্বে 'হক' মনে হয়েছিলো তা নিছক কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়।

এ অবস্থা দেখে তিনি অত্যন্ত পেরেশান হয়ে পড়লেন। নিজের হাল সম্পর্কে হজরত খাজা র.কে জানালেন।

হজরত খাজা র. এরশাদ করলেন, 'এখনও আপনার হালের অস্পষ্টতা কাটেনি। বাস্তব এবং অবাস্তবের মধ্যে পার্থক্য করবার মতো জ্ঞান হাসিল করতে হবে। এ শক্তি হাসিল না হওয়া পর্যন্ত আপনি রেয়াজতে রত থাকুন।'

হজরত খাজা র. এর তাওয়াজ্জোহ্ এর বরকতে দুই দিনের মধ্যেই শায়েখ আহমদ র. এর হাল পরিবর্তিত হলো। তিনি বাস্তব এবং অবাস্তব সম্পর্কে পার্থক্য করবার জ্ঞান অর্জন করলেন। তিনি মওজুদে হাকিকিকে কল্পনা থেকে পৃথক করে ফেললেন এবং সেফাতমূলক কার্যাবলীকে আল্লাহ্পাকের তরফ থেকে অস্তিত্ববান দেখতে পেলেন। এরপর সেই সমস্ত কার্যাবলীকে আবার অলীক মনে হলো। মওজুদ রইল শুধুমাত্র এক জাত পাক।

পরিবর্তিত হাল সম্পর্কেও তিনি মোর্শেদকে জানালেন। সব শুনে হজরত খাজা র. এরশাদ করলেন, 'ফরক বাদাল জমআ' অর্থাৎ একত্রিত হওয়ার পর পৃথক হওয়া একেই বলে। এখানেই কাজ শেষ। এই স্তরই পূর্ণ স্তর।'

হজরত খাজা র. আরো বললেন, 'আপনার মধ্যে মাহবুবিয়াত ও মুরাদিয়াত এর নেসবত (সম্পর্ক) আছে। মুহিব্বিয়াত ও মুরিদিয়াত ব্যক্তিদের তুলনায় এরকম নেসবতধারী ব্যক্তিগণ অতি সহজে সুলুকের সমস্ত স্তর অতিক্রম করতে সক্ষম হন।'

দরবারের অবস্থা এখন অন্যরূপ ধারণ করেছে। সবাই বিস্মিত হলো। সেরহিন্দের ফকির এখানে আসার পর থেকে দরবারের সবকিছু যেনো তাঁকে ঘিরেই আবর্তিত হচ্ছে। হজরত খাজা র. এর দৃষ্টি আর কোনোদিকে নেই। তাঁর চিন্তা, ধ্যান ধারণা, আশা আকাঙ্খা সবকিছু কেবল শায়েখ আহমদকে নিয়ে। দরবারে যেনো আর কেউ নেই।

দরবারের নিয়ম ছিলো, শায়েখ তাজ অন্যান্য মুরিদগণের হাল সম্পর্কে হজরত খাজাকে জানাতেন। সব শুনে হজরত খাজা প্রয়োজনীয় এরশাদ করতেন। কিন্তু শায়েখ আহমদ সে নিয়মের ব্যতিক্রম। তিনি সরাসরি নিজের হাল হজরত খাজাকে জানাবার এজাজত পেয়েছেন।

দরবারে একদিন এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটলো। হঠাৎ শায়েখ আহমদ র. এর মনে সেদিন কি ভাবের উদয় হয়েছিলো কে জানে, তিনি শায়েখ তাজ র. এর দিকে তাওয়াজ্জোহ দিলেন। এর প্রতিক্রিয়ায় শায়েখ তাজ সংজ্ঞা হারিয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন।

ঘটনা সম্পর্কে হজরত খাজা বাকী বিল্লাহ্ র. কে জানানো হলো। তিনি শায়েখ আহমদের নিকট এর কারণ জানতে চাইলেন। শায়েখ আহমদ সব খুলে বললেন।

তাঁর কথা শুনে হজরত খাজা স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। তিনি পাথরের মতো নীরব হয়ে গেলেন। দরবারে উপস্থিত খাদেমগণও নীরব। কারো মুখে কোনো কথা নেই। দীর্ঘক্ষণ ধরে সারা দরবারে জমে রইল অখণ্ড নীরবতা।

ছাব্বিশ

মোর্শেদের দরবারে আড়াই মাস কেটে গেছে। এই আড়াই মাসেই শায়েখ আহমদ র. হাসিল করলেন নকশবন্দিয়া সিলসিলার পূর্ণ কামালাত।

এ সফলতা শুধু শায়েখ আহমদের নয়। এ সফলতা হজরত খাজা বাকী বিল্লাহ্ র. এরও। এরূপ যোগ্য তরবিয়ত করবার সুযোগ যাঁর নসিবে ঘটে, তিনিও তো বুলন্দ নসিব বুজর্গ। প্রত্যেক মোর্শেদই চান তাঁর রুহানী ফরজন্দের মধ্যে ফুটে উঠুক সাফল্যের জান্নাতি কুসুম।

হজরত খাজার হিন্দুস্তান সফর এতোদিনে সফল হয়েছে। সেই তোতাপাখি তিনি পেয়েছেন। তাঁর কাছে পৌঁছে দিয়েছেন নেসবতে সিদ্দিকীর অমূল্য আমানত। তাঁর মোর্শেদের হুকুম বাস্তবায়িত হয়েছে। সমস্ত প্রশংসাই আল্লাহ্তায়ালার জন্য। এই সফলতা দ্বারা আল্লাহ্তায়ালার ইচ্ছাই পূর্ণ হয়েছে।

এক মোবারক মুহূর্তে হজরত খাজা র. তাঁকে খেলাফত প্রদান করলেন।

এবার বিদায়ের পালা। এই তো নিয়ম। মিলনের পরে আসে বিদায়ের পালা। তখন বিরহের মাঝে একাকার হয়ে থাকে মিলনের সুখ স্মৃতি ও আনন্দের অনুভূতিগুলো। বিরহকে তখন কবুল করে নিতে হয়।

হজরত খাজা র. এরশাদ করলেন, এবার আপনাকে সেরহিন্দে ফিরে যেতে হবে। তালেবে মাওলাগণের দিলে জারি করতে হবে এই শ্রেষ্ঠ তরিকা নকশবন্দিয়ার নূরানী নহর।

মোর্শেদের হুকুম। বিনা বাক্যব্যয়ে পালন করতে হবে। শায়েখ আহমদ র. সেরহিন্দে ফিরে গেলেন।

সাতাশ

দরবার এখনও বসে। তালিম তরবিয়ত চলে। হজরত খাজা র. এর উপস্থিতিতে দরবারে প্রেমের প্রস্রবণ ধারা বয়ে চলে। অটুট গাম্ভীর্য আর নীরবতার প্রাচুর্যে ভরা থাকে দরবার।

নকশবন্দি বুজর্গগণের এমনই ধারা। নীরবতার মধ্য দিয়ে চলে তাদের লেন-দেনের পালা। তাইতো তাঁরা বলে থাকেন, 'যে ব্যক্তি আমাদের মৌনতা দ্বারা উপকৃত হলো না– সে আমাদের কথা দ্বারা কিভাবে উপকৃত হতে পারে।'

দরবার চলে। সেই দরবার। কিন্তু তার রূপ যেনো একটু ভিন্ন রকমের। শায়েখ আহমদ নেই। নয়নের নূর– পেয়ারা ফরজন্দ দরবারে নেই। সেই তোতাপাখি নেই। তাই সবকিছু থেকেও কেমন যেনো বিষাদে ভরা এই দরবার। সবই আছে, তবু যেনো শূন্যতায় ভরা সবকিছু। দরবারের মাঝখানে শূন্য খাঁচা পড়ে আছে, নেই শুধু সেই তোতাপাখি।

তবুও দরবার চলে। ফকিরের দরবার। এ দরবারে সারাক্ষণ জ্বলে প্রেমের প্রদীপ। আল্লাহ্ প্রেমিকগণ যে প্রদীপের দিকে পাগল পতঙ্গের মতো বারবার ছুটে আসে। আল্লাহ্ প্রেমের বিশুদ্ধ অনলে বিলীন হয়ে যেতে চায়।

একদিন হজরত র. একটি চিঠি পেলেন। মোর্শেদের চিঠি। অন্তর আলোড়িত হলো। কতো স্মৃতি জেগে উঠলো মনে। সেই মাওরা উন্নাহার। সেই সুদূরের চিঠি। প্রিয় মোর্শেদ তাঁর এই গোলামকে আজো মনে রেখেছেন।

হজরত খাজেগী আমকাংগী র. লিখেছেন এক দীর্ঘ চিঠি। চিঠির শেষ দিকে লিখেছেন দু'টি বয়াত।

জানি না তো কখন সে আসবে কাছে
মুদ্দত কেটে গেলো মউত স্মরণে,
না ঘুমিয়ে সারাক্ষণ জেগে থাকি পাছে
গাফলতি হয়ে যায় প্রথম মিলনে।

চিঠি পড়ে হজরত খাজা চিন্তিত হলেন। তাইতো। এভাবেই সবাই যায়। সবাইকে যেতে হয়। হে প্রাণের মোর্শেদ, তুমি কি রকম আর আমার নসিবই বা কি রকম। মাত্র একবারের মোলাকাত। মাত্র তিনদিনের মোলাকাত। তারপর

আমাকে তুমি কোথায় পাঠিয়ে দিলে, কোন তেপান্তরে। কোথায় দিল্লী আর কোথায় মাওরা উন্নাহর। আর কি দেখা হবে জীবনে, আর কখনো কি দেখা হবে তোমার সাথে। চিঠি পড়ে হজরত খাজার অন্তর কেবলি ছটফট করতে লাগলো প্রিয় মোর্শেদের জন্য।

না। আর মোলাকাত হলো না, কিছুদিন পর তিনি সংবাদ পেলেন, তেইশে শাবান হজরত খাজেগী র. মাশুকের দাওয়াত কবুল করেছেন। হাজার আট হিজরীর তেইশে শাবান।

আটাশ

সেরহিন্দে নূরের প্লাবন জারী হয়েছে।

হজরত খাজা র. প্রায়ই সেরহিন্দ থেকে চিঠি পান। শায়েখ আহমদ জানান, সেরহিন্দে তালেবে মাওলাগণের ভিড় বেড়ে চলেছে। সবাই নকশবন্দি তরিকার সঞ্জীবনী ধারা আকণ্ঠ পান করে চলেছেন। শায়েখ আহমদ তাঁদের তরবিয়তের প্রতি সদা সজাগ। তাঁদের কারো কারো হাল তিনি হজরত খাজার নিকট বর্ণনা করেন। প্রয়োজনীয় পরামর্শ কামনা করেন। প্রয়োজনীয় সওয়াল করেন। আবার কখনো চিঠিতেই বর্ণনা করেন, দুর্লভ মারেফাতসমূহ থেকে আহরিত সূক্ষ্ম তত্ত্বজ্ঞানের অভিজ্ঞান।

হজরত খাজা র. তাঁর জন্য আল্লাহ্তায়ালার দরবারে দোয়া করেন। আল্লাহ্পাক তাঁকে মদদ করুন। আল্লাহ্পাক তাঁর শেজর শরীফকে দীর্ঘস্থায়ী করুন। আল্লাহ্পাক তাঁকে সর্ববিষয়ে মাফুজ রাখুন।

কি অপরূপ আদব তাঁকে আল্লাহ্পাক নসিব করেছেন। কি হৃদয় আল্লাহ্পাক তাঁকে দান করেছেন। কি জ্ঞান আল্লাহ্পাক তাঁকে ঢেলে দিয়েছেন। তুলনাহীন । বর্ণনাহীন।

কতোদিন দেখা নেই। নয়নের নূর, পেয়ারা ফরজন্দ শায়েখ আহমদকে কতোদিন দেখেননি তিনি। শুধু রূহানী সংযোগ থাকলে কি হবে। সুরত যে সুরতকে দেখার জন্য পাগল হয়।

একদিন হজরত খাজা র. তাঁর চিঠি পেলেন। তিনি লিখেছেন ঃ

‘নগণ্য খাদেমের নিবেদন এই যে, অনেক দিন হলো হুজুরের দরবার শরীফের কোনো চিঠি পাই না। রমজান মাস আসন্ন। এ মাস মোবারক হোক।

কোরআন মজিদ আল্লাহ্তায়ালার জাত ও শান বাচক পূর্ণতাসমূহের সমষ্টি এবং মূল বস্তুর আওতাভুক্ত। কোনো প্রতিবিম্ব সেখানে অনুপস্থিত এবং প্রাথমিক যোগ্যতা উহারই প্রতিবিম্ব। কোরআন মজিদের সঙ্গে রমজান মাসের বিশেষ সম্বন্ধ আছে। এ জন্যই রমজান মাসে কোরআন শরীফ নাজিল হয়েছে। আল্লাহ্তায়ালার বাণী ‘রমজান এমন এক মাস যে মাসে কোরআন নাজিল করা হয়েছে’– উল্লিখিত বাক্য এ কথারই পরিচয় বহন করে। সুতরাং উক্ত মাস যেনো সমস্ত প্রকার খায়ের ও বরকতের মহাসমুদ্র। সারা বছর ধরে কাউকে অবিরামভাবে বরকত দান করলেও তা যেনো মহাসমুদ্রের এক বিন্দু পানির মতো। এই মাস শান্তির সঙ্গে অতিবাহিত হলে– সারা বছর শান্তির সঙ্গে অতিবাহিত হবে। অতএব, যে এই মাস শান্তির সঙ্গে অতিক্রম করতে পারবে, তার জন্য সুসংবাদ। তা না হলে সে নিজেকে বরবাদ করবে এবং বরকত থেকে বঞ্চিত হবে।

এই কারণেই এ মাসে কোরআন শরীফ খতম করা সুন্নত সাব্যস্ত হয়েছে। যেনো মৌলিক ও প্রতিবিম্বজাত– দুই প্রকার বরকত লাভ করা সম্ভব হয়।

...পূর্বে প্রাথমিক যোগ্যতা সম্পর্কে যে বর্ণনা করা হয়েছে, যাকে হকিকতে মোহাম্মদী বলে মনে করা হয় এবং তাকে সেফাত সংযুক্ত জাত পাক থেকে আগত যোগ্যতা বলে ধারণা করা হয়। কিন্তু তা প্রকৃত ধারণা নয়। প্রকৃত যোগ্যতা জাত এবং শান সম্পর্কিত পূর্ণতাসমূহের সঙ্গে জ্ঞান অর্জনকারী এলেম যা কোরআন মজিদের হকিকতের মূল উদ্দেশ্য। আল্লাহ্তায়ালার জাত এবং সেফাতসমূহের মধ্যবর্তী যে অভিন্ন যোগ্যতা (কাবেলিয়াতে এত্তেহাফ) বিদ্যমান– উহাই অন্যান্য পয়গম্বরগণের হকিকত। বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী তা বিভিন্ন জনের হকিকত হয়েছে। কিন্তু হকিকতে মোহাম্মদীর যোগ্যতা অন্যরূপ। উহা যদিও প্রবিবিম্ব থেকে মুক্ত নয়, তবুও তা প্রতিবিম্বের সঙ্গে ব্যবধান রাখে।

মোহাম্মদীয়াল মাশরাবগণের হকিকত হচ্ছে আল্লাহ্তায়ালার এতেবারে এলেম যা উক্ত বিভিন্ন গুণাবলীর মধ্যে কতিপয় গুণের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখে। হজরত নবীয়ে করিম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের যোগ্যতা আল্লাহ্পাকের জাত পাক এবং বিভিন্ন যোগ্যতাসমূহের মধ্যে মধ্যস্থ স্বরূপ।

...অনেকে এরকম বলেছেন যে, কাবেলিয়াতে এত্তেছাফ বা অভিন্ন যোগ্যতা কখনো অপসারিত হয় না এবং হকিকতে মোহাম্মদী স. সব সময় ব্যবধান স্বরূপ বিদ্যমান থাকে। কিন্তু এ ধারণা ঠিক নয়। কারণ, কাবেলিয়াতে মোহাম্মদী স. আল্লাহ্পাকের জাত পাকে এতেবার বা অনুময় মাত্র। ইহা অপসারিত হওয়া সম্ভব। বরং অপসারিত হয়েও থাকে।

...এরকম প্রকৃত এবং প্রতিবিম্বজাত বহু প্রকার এলেম আমার প্রতি বর্ষিত হচ্ছে। তার অধিকাংশই লিখে রাখছি। কুতুবিয়াতের মাকাম প্রতিবিম্বসম্ভূত সূক্ষ্মতা এলেম সমূহের মাকাম এবং ফরদিয়াতের মাকাম মূল বৃত্ত থেকে উদ্ভূত মারেফাত সমূহের অবতরণের মাধ্যম সদৃশ। এই দুই সম্পদ একত্রিত না করলে এর পার্থক্য সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা সম্ভব নয়। এ কারণেই কোনে কোনো মাশায়েখ প্রাথমিক যোগ্যতা (কাবেলিয়াত) বা প্রথম তা-আইয়ুনকে জাতপাক থেকে আলাদা মনে করেন না এবং উক্ত কাবেলিয়াতের দর্শনকেই তাজাল্লিয়ে জাতির দর্শন বলে ধারণা করেন। প্রকৃত কথা আমি যেরকম লিখেছি, ঠিক সেই রকম। আল্লাহ্পাক হককে সুদৃঢ় করেন। তিনিই একমাত্র পথ প্রদর্শনকারী। আপনি যে রেসালা লিখবার জন্য আদেশ করেছেন, তা এখনও শেষ করতে পারিনি। বিলম্বের মধ্যে আল্লাহ্পাকের কি যে হেকমত আছে, তা তিনিই জানেন। আর অধিক লেখা আদবের সীমা অতিক্রমতুল্য।’

ঊনত্রিশ

হজরত খাজা বাকী বিল্লাহ্ র. একদিন সংবাদ পেলেন, শায়েখ আহমদ র. দিল্লী আসছেন। আনন্দে তাঁর হৃদয় উতলা হয়ে উঠলো। পেয়ারা ফরজন্দ, নয়নের নূর, হৃদয়ের উত্তরাধিকারী– আবার দিল্লী আসছেন। আবার তার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে। সেই তোতাপাখি আবার ধরা দেবে। আবার মহফিলে ফিরে আসবে বেহেশতী শোভা– প্লাবিত হবে মহফিল নূরের বন্যায়।

হজরত খাজা র. তাঁর খাদেম এবং সালেকদের সঙ্গে নিয়ে কাবুলী দরওয়াজা পর্যন্ত এগিয়ে গেলেন। সেখানে শায়েখ আহমদকে এস্তেকবাল জানালেন এবং সসম্মানে তাঁকে নিয়ে ফিরে এলেন নিজের খানকায়।

খানকার অবস্থা এবার আরো বদলে গেলো। হজরত খাজা র. বিস্ময়ের সাথে দেখলেন, শায়েখ আহমদের রূহানী নেসবত এবার মধ্যাহ্নের সূর্যের মতো ছড়িয়ে পড়েছে। তাঁর প্রতি আল্লাহ্পাকের খাস রহমত যেনো অসংখ্য ধারায় বিরামহীনভাবে বর্ষিত হচ্ছে। নিগূঢ় মারেফাতের অফুরন্ত ঐশ্বর্যে তিনি এখন সম্পূর্ণ ও পরিপূর্ণ।

খানকার অবস্থা এবার সম্পূর্ণ বদলে গেলো। আলোকোজ্জ্বল হলো। তাঁর প্রতি আল্লাহ্‌পাকের খাস রহমত যেনো অসংখ্য ধারায় বিরামহীনভাবে বর্ষিত হচ্ছে। নিগুঢ় মারেফতের অফুরন্ত ঐশ্বর্যে তিনি এখন পরিপূর্ণ। খানকার অবস্থা এবং অবস্থানও এবার সম্পূর্ণ বদলে গেলো। হজরত খাজা আর ওস্তাদ রইলেন না। তিনি হলেন শাগরেদ। ওস্তাদের আসনে হজরত খাজা র. এর বদলে এবার সমাসীন হয়েছেন শায়েখ আহমদ। হজরত খাজা র. মুরিদের মতো হজরত শায়েখ আহমদ র. এর কাছে থেকে উচ্চ স্তরের দুর্লভ ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মারেফাতসমূহ সংগ্রহ করতে লাগলেন।

সেই স্বপ্ন। তোতাপাখির মধুর স্বপ্ন হজরত খাজা দেখেছিলেন, তোতাপাখি তাঁর মুখ চিনি দিয়ে ভরে দিচ্ছে। আজ বাস্তবে তিনি তাঁর আস্বাদ পাচ্ছেন। চিনির চেয়েও সুমিষ্ট আস্বাদে আজ তাঁর মুখ ও বুক ভরে গিয়েছে।

এ রকমই হয়। ফয়সালা আল্লাহ্‌পাকের তরফ থেকে আসে। তিনি যা ইচ্ছে করেন তাই হয়। মানুষ আল্লাহ্‌পাকের ইচ্ছা ও সিদ্ধান্তকে বুঝতে চায় না, বুঝতে পারে না। নিজেদের ক্ষুদ্র জ্ঞান বুদ্ধি দিয়ে সম্ভব অসম্ভবের চিন্তা করে।

কিন্তু হজরত খাজা তো আর পাঁচ জনের মতো নন। আল্লাহ্‌পাক তাঁকে দিয়েছেন সহজ সত্য দৃষ্টি। সত্যকে গ্রহণ করার মতো এবং প্রকাশ করার মতো নিষ্কলুষ অন্তর। যে অন্তর শুধু সত্যের এবং মহত্বের আলো সকল মিথ্যা এবং কলুষতা থেকে মানুষকে সহজ সরল পথে নিয়ে যায়– যে পথ চিরকালের পবিত্রতা ও মুক্তির পথ।

হজরত খাজাকে দরবারের অন্যান্যরা বুঝতে পারেন না। বুঝতে পারেন না তাঁর ব্যতিক্রমী ও অসংকোচ স্বীকারোক্তিকে। সারা পৃথিবীতে কোথাও যে এরূপ দৃষ্টান্ত আর খুঁজে পাওয়া যাবে না, যিনি তাঁর মুরিদকে পরে পীর হিসাবে সসম্মানে স্বীকার করে নিয়েছেন। এমন দৃষ্টান্ত আর কোথাও নেই। তাই তাঁরা সকলে আশ্চর্য হন, বিস্ময়ে হতবাক হন।

হজরত খাজা র. নিজেকে সম্পূর্ণরূপে হজরত শায়েখ আহমদের নিকট সমর্পণ করলেন। সেই সঙ্গে তাঁর সমস্ত খলিফা এবং মুরিদগণকেও তাঁর নিকট সোপর্দ করলেন।

হজরত শায়েখ আহমদ র. মহফিল পরিচালনা করেন। মহফিল শেষে অত্যন্ত আদবের সঙ্গে রুখসত হন হজরত খাজা র.। পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেন না যাতে আদবের খেলাফ হয়।

হজরত শায়েখ আহমদ র.। তাঁর মতো বাআদব মুরিদই বা আর কে আছে। এমন দৃষ্টান্তই বা আর পৃথিবীতে কোথায় আছে। তিনি শুধু মনে করেন মোর্শেদ হুকুম করেছেন বলেই তাঁর হুকুম মতো সব দায়িত্ব তিনি নিজের কাঁধে তুলে

নিয়েছেন। মহফিল পরিচালনার দায়িত্ব, দরবারের অন্যান্য সকলের দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করেছেন, শুধু মোর্শেদের হুকুমের বরখেলাফ না করার জন্য।

হজরত খাজার আচরণে তিনি লজ্জিত হন। সওয়াল করেন, 'এই নিকৃষ্ট খাদেমের প্রতি হজরত যেরূপ আদব ও সম্মান প্রদর্শন করেন, তাতে এ অধম লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়।'

হজরত খাজা জবাব দেন, 'আল্লাহ্‌পাকের নির্দেশ ছাড়া আমি কিছু করি না। গায়েব থেকে যা করার জন্য আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তার বাইরে আমি কিছুই করিনি।'

দরবারে সবাই কিন্তু এ অবস্থা মনে প্রাণে মেনে নিতে পারলেন না। কেউ কেউ হজরত শায়েখ আহমদের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে উঠলেন। তাঁদের মনোভাব বুঝতে পেরে হজরত খাজা র. বিরক্ত হলেন। এরশাদ করলেন, 'তোমরা যদি নিজেদের ইমানের নিরাপত্তা কামনা করো তবে হজরত শায়েখ আহমদ সম্পর্কে অন্তরে উত্তম ধারণা রাখো এবং তাঁর প্রতি সম্মান ও আদব প্রদর্শন করো। কারণ, তিনি রূহানী জগতের এমন এক সূর্য যাঁর আবির্ভাবের ফলে আমাদের মতো শত শত নক্ষত্রের আলো ম্লান হয়ে পড়েছে। মনে রেখো, উম্মতে মোহাম্মদীর মধ্যে যে চারজন শ্রেষ্ঠ আউলিয়া আছেন, তিনি তাঁদের অন্যতম।'

তিরিশ

হজরত খাজা শায়েখ আহমদ র. তৃতীয়বার দিল্লী এলেন। দেখলেন, হজরত খাজা র. আগের চেয়ে অনেক শীর্ণ ও দুর্বল হয়ে গিয়েছেন। তাঁর সমস্ত শরীর জুড়ে অকালবার্দ্ধক্য ও শক্তিহীনতার ছাপ।

হজরত খাজা র. এরশাদ করলেন আমার শরীরের যা অবস্থা তাতে আল্লাহ্‌তায়ালা আর ক'দিন আমাকে বাঁচিয়ে রাখবেন জানি না। মনে হয় আর দেরী নেই।

হজরত শায়েখ আহমদ চেয়ে দেখেন। সত্যের সাধক, সত্যের সেবক, নেসবতে সিদ্দিকীর কিম্মতী কাসেদ কেমন যেনো হয়ে গিয়েছেন। মনে হয় তাঁর কাজ তিনি শেষ করে ফেলেছেন। কাসেদ পৌঁছে দিয়েছেন নেসবতে সিদ্দিকীর

অমূল্য ফরমান। এবার তাই তিনি মাশুকের দরবারে যাবার জন্য উন্মুখ হয়ে রয়েছেন। প্রতীক্ষা করছেন রফিকে আলার সঙ্গে বিচ্ছেদহীন মিলনের জন্য।

হজরত খাজা তাঁর দুই শিশু পুত্রকে হজরত শায়েখ আহমদ র. এর সামনে হাজির করলেন। এক জনের নাম ওবায়দুল্লাহ্ আর এক জনের নাম আবদুল্লাহ।

হজরত খাজা র. এরশাদ করলেন, 'এদের প্রতি তাওয়াজ্জোহ দিন।'

হজরত শায়েখ আহমদ র. এরশাদ পালন করলেন।

হজরত খাজা র, আবার এরশাদ করলেন, 'আপনার পীর আম্মার প্রতিও গায়েবানা তাওয়াজ্জোহ দিন।'

হজরত শায়েখ আহমদ র. তাই করলেন। এ সব তাওয়াজ্জোহের প্রতিক্রিয়া কিছু হজরত খাজার উপরও পড়লো।

হজরত খাজা র. ঘোষণা করলেন, 'মহা শানদার নকশবন্দিয়া তরিকার মধ্যে বর্তমানে শায়েখ আহমদের মতো মর্যাদাসম্পন্ন আর কেউ এই আসমানের নীচে নেই। তিনি মোকাম্মেল, মুরাদ, মাহবুব ও কুতুব। সাহাবা, তাবেঈন, কামেলীন, মোজতাহিদ ইমামগণের পরে এরকম বিশিষ্ট ব্যক্তি পৃথিবীতে খুব কমই এসেছেন। দিল্লীতে এতোদিন ধরে আমি পীর মুর্শিদি করিনি। খেলাধূলা করেছি মাত্র। কিন্তু সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্পাকের জন্য। আমার সামান্য প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়নি। আমার তরবিয়তের ফলে শায়েখ আহমদের মতো মর্যাদাবান ব্যক্তির আত্মপ্রকাশ ঘটেছে।'

তিনি আরও ঘোষণা করলেন, 'মিঞা শায়েখ আহমদ এবং আমার সম্পর্ক খাজা আবুল হাসান খেরকানী র. এবং তাঁর মুরিদ আবদুল্লাহ আনছার র. এর মতো। আবদুল্লাহ আনছার র. বলেছেন, 'আমার পীর যদি বর্তমানে বেঁচে থাকতেন তবে আমার মুরিদ হওয়া ছাড়া তাঁর কোনো উপায় ছিলো না। মিঞা শায়েখ আহমদের মধ্যে কুতুবে মাদার এবং কুতুবে এরশাদের কামালত একত্রিত হয়েছে। তাঁর তোফায়েলে আমি জানতে পেরেছি যে, তৌহিদে অজুদি (হামউস্ত) অর্থাৎ 'সবই খোদা' মতবাদকে সংকীর্ণ সড়কের সঙ্গেই তুলনা করা চলে। প্রকৃত রাজপথ অবশ্যই অন্যরূপ। বাস্তবিকই তিনি এমন এক সূর্য যার রওশনিতে দোজাহান আলোকিত হয়ে উঠেছে।'

আবার বিদায় নিবার সময় এলো। এটাই শেষ বিদায় কি না কে জানে। হজরত শায়েখ আহমদ বিদায় নিলেন। তিনি সেরহিন্দে ফিরে গেলেন।

দিল্লীর দরবারে আবার বিষাদের ছায়া পড়লো। আর কতোদিন এ বিষাদ বইতে হবে কে জানে। এখন তো তার ছুটির সময়। যার আমানত তাকে তো পৌঁছে দেয়া হয়েছে। কোন অদৃশ্য লোক থেকে কিসের সুর ভেসে আসে। কি তার ভাষা কিছুই বোঝা যায় না। এবার কি তবে যেতে হবে? কবে, কবে যেতে হবে?

একত্রিশ

কারামতের প্রাচুর্য অনুযায়ী আউলিয়াগণের মধ্যে ছোট বড় পার্থক্য নির্ণীত হয় না। অনেক কম কারামতসম্পন্ন অলীও অধিক সংখ্যক কারামতসম্পন্ন অলীর চেয়ে আল্লাহ্পাকের দরবারে অধিক মর্যাদাসম্পন্ন হতে পারেন।

কিন্তু তবুও কারামত যেনো আউলিয়া জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। কিছু কারামত প্রত্যেক আউলিয়ার জীবনেই সংঘটিত হতে দেখা যায়।

হজরত খাজা র. এর জীবনেরও অনেক কারামত সংঘটিত হয়েছে। বরকতের জন্য তার কিছু উল্লেখ করা হলো।

একবার হজরতের এক প্রতিবেশী বিপদে পড়লেন। নায়েবে হাকিম তার উপর জুলুম শুরু করে দিলেন এবং এই বলে হুমকি দিলেন যে, তাঁকে ঘর থেকে বের করে দেয়া হবে। একথা শুনে হজরত নিজে নায়েবে হাকিমের নিকট হাজির হয়ে প্রতিবেশীকে মাফ করে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করলেন।

কিন্তু নায়েবে হাকিম হজরতের কথার কোনো গুরুত্বই দিলেন না। হজরত তাঁকে আবারও বুঝিয়ে বললেন। তাতেও কোনো ফল হলো না। তখন হজরতের স্বভাবে গয়রত দেখা দিলো।

তিনি বললেন, 'আমাদের খাজেগান দরবেশেগণ সিলসিলার সম্মানের দিক থেকে প্রবল মর্যাদাবোধ সম্পন্ন। শুধু আপনিই নন, আপনার সঙ্গের লোকজনকেও এই জুলুমের শাস্তি ভোগ করতে হবে।'

এই ঘটনার দুই তিনদিন পর নায়েবে হাকিম এবং তাঁর সঙ্গীগণ চুরির অপরাধে ধরা পড়লেন এবং মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হলেন।

একবার এক বৃদ্ধ আলেম এক যুবতী নারীকে বিয়ে করলেন। বিয়ের পর তিনি বুঝলেন যে, সদ্য বিবাহিতা স্ত্রীর বাসনা তিনি পূর্ণ করতে পারছেন না। তাই লজ্জিত হয়ে শেষ পর্যন্ত তিনি দেশ ত্যাগের সিদ্ধান্ত নিলেন। হজরত খাজা তাঁর তাসাররুফাত (দিলের অবলোকন শক্তি) দ্বারা এ ঘটনা জানতে পারলেন। আলেমের প্রতি তার মেহেরবানী হলো।

একদিন হজরত ঘোড়ায় চড়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। পথে আলেমের সঙ্গে দেখা হলে তিনি তাঁর সম্মানের জন্য ঘোড়া থেকে নামলেন। কাছে গিয়ে আলেমকে নিজের বুকের সাথে শক্ত করে জড়িয়ে ধরলেন। এর বরকতে আলেম ফিরে পেলেন তাঁর পুরুষত্বশক্তি। পরবর্তী সময়ে তিনি সন্তান সন্ততিও লাভ করেছিলেন।

একদিন এক মহিলা হজরতের খেদমতে হাজির হয়ে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, 'হজরত, আমার সন্তান সন্ততি হয় না বলে আমার স্বামী দ্বিতীয় বিবাহ করতে চান। আমি তা সহ্য করতে পারবো না।'

হজরত খাজা তখন ঔষধ পান করছিলেন। তিনি সামান্য পান করা বাকী ঔষধ মহিলার হাতে দিয়ে বললেন, এর মধ্যে প্রাণশক্তি আছে। আপনি পান করুন।

মহিলা তাই করলেন। এর ফলে তাঁর বন্ধ্যাত্ব কেটে গেলো। তিনি সন্তানাদি লাভ করলেন। তাঁর স্বামীও দ্বিতীয় বিবাহের বাসনা ত্যাগ করলেন।

এক ব্যক্তি রূহানী মত্ততায় ভুগছিলেন। মত্ততা বশতঃ প্রায়ই তাঁর মুখ দিয়ে শরীয়তের পরিপন্থী অনেক বাক্য উচ্চারিত হতো। অনেক সময় শরীয়তের খেলাফ কাজও তিনি করে ফেলতেন। বহু চেষ্টা করেও তিনি এ অবস্থা থেকে নিষ্কৃতি পাচ্ছিলেন না।

একদিন তিনি হজরত খাজার খেদমতে নিজের হালাত পেশ করবার জন্য হাজির হলেন। হজরত খাজা তার প্রতি শুধুমাত্র একবার তাকালেন। এতেই উক্ত ব্যক্তির সমস্ত মত্ততা বিলুপ্ত হয়ে গেলো।

একবার রমজান মাসে তাঁর শ্রেষ্ঠ খলিফা হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি শায়েখ আহমদ ফারুকী সেরহিন্দি র. হজরত খাজার খেদমতে ফালুদা পাঠিয়েছিলেন।

খাদেম ফালুদা নিয়ে সরাসরি হজরতের হুজরা খানার দরজায় হাজির হলেন।

হজরত নিজেই ফালুদা গ্রহণ করে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার নাম কি?

খাদেম আরজ করলেন, 'আমার নাম বাবা।'

হজরত বললেন, 'তুমি যখন শায়েখ আহমদের খাদেম, তখন সত্যিই তুমি বাবা।'

একথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই প্রেমমত্ততার জজবা ও নেসবতের প্রতিক্রিয়া খাদেমের মধ্যে প্রবল হয়ে উঠলো। তিনি কোনো প্রকারে হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি শায়েখ আহমদ ফারুকী সেরহিন্দি র. এর খেদমতে গিয়ে হাজির হলেন।

অবস্থা দেখে হজরত মোজাদ্দেদ র. জিজ্ঞেস করলেন, 'কি হয়েছে তোমার?'

খাদেম জবাব দিলেন, আসমান জমীনের সব জায়গায় কেবল রঙ্গীন অনন্ত নূর নজরে আসছে। সে নূরের বর্ণনা দেয়া যায় না।'

হজরত মোজাদ্দেদ র. এরশাদ করলেন, হয়তো হজরত খাজা তোমার মুখোমুখি হয়েছেন। তাই সে সূর্যের আলোকচ্ছটা তোমার উপর পড়ে এমন হাল হয়েছে।

পরদিন তিনি খাদেমকে পুনরায় হজরত খাজার খেদমতে পাঠালেন। হজরত খাজা তাঁকে দেখা মাত্র হেসে বললেন–

যখন রোজ হাশরে ক্ষতিপূরণ করবে দাবী শহীদান,
তখন একটুকরা হাসি হেসে বন্ধ করুণ সব জবান।

এক বৃদ্ধার তিন চার বছর বয়সের এক ছেলে ছিলো। ছেলেটি একদিন ফিরোজাবাদের দূর্গের প্রাচীরের উপর থেকে পড়ে যায়। প্রায় তিরিশ গজ উঁচু এ প্রাচীরের নীচে ছিলো শক্ত পাথর। প্রাচীর থেকে পড়েই ছেলেটি সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলে। তার শ্বাস রুদ্ধ হয়ে যায় এবং কান দিয়ে দরদর করে তাজা রক্ত বের হতে থাকে।

ঘটনা দেখে বৃদ্ধা মহিলা উদভ্রান্তের মতো ছুটে আসেন হজরত খাজার দরবারে। তিনি বিলাপ করে তাঁর ছেলের জীবন ভিক্ষা চাইতে থাকেন।

হজরত খাজা তাঁর স্বভাব অনুযায়ী নিজের কারামত গোপন রাখার উদ্দেশ্যে একটি হেকিমি শাস্ত্রের কেতাব সামনে খুলে ধরলেন। কেতাবের পাতা কিছুক্ষণ উল্টালেন। তারপর এরশাদ করলেন, 'মনে হয় ছেলে বেঁচে যাবে।'

তখন যারা উপস্থিত ছিলেন সবাই অবাক হলেন। এরূপ কথা কি কেতাবে লেখা থাকে? কিন্তু কেউ কিছু বলতে সাহস পেলেন না।

একটু পরেই দেখা গেলো সেই শিশুটি সম্পূর্ণ সুস্থ অবস্থায় হাজির হয়েছে। ঘটনা দেখে সবাই স্তম্ভিত হয়ে গেলো।

হজরত খাজা বাকী বিল্লাহ্ র. এর বেশুমার কারামত আছে। কিন্তু তাঁর সবচেয়ে বড় কারামত ছিলো তিনি নকশবন্দিয়া তরিকার সহজ পদ্ধতি দ্বারা অতি সহজেই মানুষকে আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পারতেন। এই কারামতই মূল কারামত। বরং এই কারামতের তুলনায় অন্য কোনো কারামত যেনো কারামতই নয়।

এই তরিকার নেসবতের উচ্চতা ও সহজসাধ্যতা সম্পর্কে তিনি জনৈক অনুসারীকে যে নসিহত করেছিলেন তাও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

উক্ত অনুসারী একদিন হজরতের খেদমতে হাজির হয়ে একটি রেসালার পাঠ গ্রহণ করবার জন্য আরজি জানালেন। হজরত দুদিন পর্যন্ত রেসালার দরস দিলেন। এর মাঝে তিনি একবার উক্ত ব্যক্তিকে এরশাদ করলেন, 'বৎস। কথা শোনো। তরিকতের নেসবত ও আল্লাহ্‌র নৈকট্য কেতাব পড়ে অর্জন করার চেয়ে অনেক বেশী সহজতর ও নিকটতম।'

সত্যি সহজ এই পথ থাকতেও মানুষ এই অফুরন্ত দৌলত অর্জনের জন্য কোন চেষ্টাই করে না। এই শ্রেষ্ঠ কারামতের তুলনায় অলৌকিক কার্যকলাপকেই মানুষ বেশী মূল্যবান মনে করে। দুনিয়ার জন্য মানুষ আখেরাতকে তুচ্ছ মনে করে।

হজরত খাজা র. এর কারামতসমূহের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ কারামত হচ্ছে, তিনি দ্বিতীয় সহস্রাব্দের মোজাদ্দেদের তরবিয়ত করেছিলেন। তাঁকে যথাযথভাবে পৌঁছে দিয়েছিলেন, নেসবতে সিদ্দিকীর সেই অমূল্য পবিত্র আমানত। তাই শ্রেষ্ঠ আমানতদারের মর্যাদা তিনি লাভ করেছিলেন।

তাঁর অন্যতম কারামত ছিলো এই যে, দিল্লীতে এসে তিনি মাত্র তিন চার বছর তরিকা প্রচার করেছিলেন। এই অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁর নেসবতের নূর ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। বহু পীর পীরিমুরিদী ছেড়ে দিয়ে তাঁর নিকট বায়াত হন। হজরত শায়েখ আবদুল হক মোহাদ্দেস দেহলবী র. এর মতো শ্রেষ্ঠ আলেম এবং কাদেরীয়া তরিকার কামেল বুজর্গও তাঁর নিকট বায়াত হয়েছিলেন। এত অল্প সময়ের মধ্যে এতো অধিক কামিয়াবির সৌভাগ্য ক'জনেরই বা হয়েছে?

বত্রিশ

হজরত খাজা বাকী বিল্লাহ্‌ র. এর বয়স চল্লিশ বছরে পড়েছে। এ দুনিয়ার হাওয়ায়, এ দুনিয়ার মাটিতে চল্লিশটি বছর কেটে গেছে। এই চল্লিশ বছরের কতো স্মৃতি কতো ঘটনা জড়িয়ে আছে তাঁর জীবনে। সেই জন্মভূমি কাবুল। সেই পাথুরে প্রান্তর, মৌন পাহাড়, সেই মাওরা উন্নাহার, বলখ, বদখশান, কাশ্মীর, লাহোর। কতো জায়গা তিনি ঘুরেছেন। দিন নেই, রাত নেই। ইশকের যন্ত্রণার আগুনে পুড়তে পুড়তে কতো দরবারে হাজিরি দিয়েছেন। কতো দিন রাত তাঁর কেটেছে অস্থিরতায়, প্রতীক্ষায় আর অনুসন্ধানে।

তারপর মোর্শেদের কাছ থেকে পেলেন সুকঠিন দায়িত্ব। পবিত্র আমানত পৌঁছে দিতে হবে দ্বিতীয় সহস্রাব্দের মোজাদ্দেদের কাছে সে দায়িত্ব তো তিনি শেষ করেছেন। তাহলে এখনো কোন যন্ত্রণা বুকে নিয়ে কিসের প্রতীক্ষায় আছেন তিনি?

হজরত খাজার এখন অদ্ভুত ভাবান্তর হয়েছে। সবারই সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ক্ষীণ হয়ে এসেছে। কারো মৃত্যু সংবাদ শুনলেই তাঁর দুচোখ পানিতে ভরে যায়। তিনি অস্ফুট স্বরে উচ্চারণ করেন, আহ্‌ সময় বড়ই সংক্ষিপ্ত।

সবাই শোনেন একথা। কিন্তু কেউ এর অর্থ বুঝতে পারেন না।

তিনি একদিন কথাচ্ছলে তাঁর বিবি সাহেবাকে বললেন, আমার বয়স যখন চল্লিশ বছর হবে, তখন একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটবে।

হজরত একদিন খাব দেখলেন। তাঁর বিবি সাহেবাকে বললেন, আমি স্বপ্ন দেখেছি। দেখলাম কে যেনো আমাকে বলছেন, আপনাকে যে উদ্দেশ্যে দুনিয়ায় পাঠানো হয়েছিলো– তা পূর্ণ হয়েছে।

হজরত একদিন বললেন, 'অল্পদিনের মধ্যে নকশবন্দিয়া তরিকার একজন ইন্তেকাল করবেন।

দিন কাটাতে হয় প্রতীক্ষার যন্ত্রণা অন্তরে চেপে রেখে। সেই মিলন লগনের আর কতো দেরী?

একদিন তিনি বললেন, আমি শুনতে পেলাম একজন বলছেন, বর্তমান জামানার কুতুবের ইন্তেকাল হয়েছে। আমি তখন আমার শোকগাঁথা কাসিদা পাঠ করতে শুরু করলাম।

দেখতে দেখতে মাহে জমাদিউস্‌ সানি এসে গেলো। এ মাসের মাঝামাঝি সময়ে হজরত রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লেন। রোগশয্যায় শায়িত অবস্থায় একদিন তিনি বললেন, হজরত খাজা ওবায়দুল্লাহ আহরার র.কে খাবে দেখলাম। তিনি আমাকে পিরহান পরিধান করতে বলছেন।

এরপর তিনি মৃদু হাসলেন। তারপর বললেন, যদি সুস্থ হয়ে উঠি তবে পিরহান পরবো। নয়তো কাফনের পিরহানই হবে সেই পিরহান।

একদিন এমন অবস্থা হলো যে সবাই মনে করলেন, হজরত আর নেই। এ সময় তিনি আল্লাহ্‌পাকের মহব্বতের উত্তাল সমুদ্রে হারিয়ে গিয়ে ইশকের অবগাহনে ডুবে ছিলেন। কিছুক্ষণ পর এ অবস্থা কেটে গেলো। হজরতের হুঁশ ফিরে এলো। তিনি বললেন, এর নামই কি মৃত্যু? এই যদি মৃত্যু হয়, তবে মৃত্যু অতি উচ্চ নেয়ামত। মন চায় না এ অবস্থা থেকে ফিরে আসতে।

সময় শেষ হয়ে আসছে। আর দেরী নেই। এখন আশেক মাশুক দু'জনেই অধীর উতলা। এখন তো সম্পূর্ণ হবে প্রেমের মহান বিজয়। মানুষের জন্য এ সময় সবচেয়ে মূল্যবান সময়। এ সময় কামেল ইনসান মৃত্যুকে অতিক্রম করেন, জয় করেন। মৃত্যুর ফটক পেরিয়ে অমর জীবনের দিকে এগিয়ে যান অনন্ত তৃষ্ণা নিয়ে।

দিল্লীর বাতাস আজ শুধু বিষাদের শোক গাঁথা ছড়িয়ে যাচ্ছে। মহান আশেক হজরত খাজা বাকী বিল্লাহ্ র. আজ চলে যাবেন। মাত্র তিনচার বছর ধরে দিল্লী দেখেছে এই মহান বুজর্গের মোবারক চেহারা। এর মধ্যেই সব শেষ হয়ে যাচ্ছে। এই ক্ষণজন্মা মানুষ আজ বিদায় নিবেন। দিল্লী আর কখনো দেখতে পাবে না আল্লাহ্‌র এই আশেক বান্দাকে।

ফেরেশতারা কি আজ নিজেদের মধ্যে কোনো মহফিলের আয়োজন করেছেন? নীল আসমানের উপরে কি কোনো সম্বর্ধনার আয়োজন করা হচ্ছে আজ হজরত খাজার ইস্তেকবালের জন্য?

পঁচিশে জমাদিউস্ সানি। হাজার বারো হিজরী। হজরত খাজা বাকী বিল্লাহ্ প্রস্তুত হলেন। জিকিরেই রত থাকতেন তিনি সব সময়। আল্লাহ্ আল্লাহ্ জিকির করতে করতেই তিনি চলে গেলেন। হজরত খাজা বাকী বিল্লাহ্ রহ. দুনিয়ার সমস্ত আকর্ষণ ছিন্ন করে তাঁর নিজের ক্ষুদ্র দরবার ছেড়ে চলে গেলেন মাশুকের অন্তহীন দরবারে।

সেখানেই কবর খোঁড়া হলো, যেখানে একদিন তিনি কয়েকজন সঙ্গীসহ এসেছিলেন। বসেছিলেন সেখানে কিছুক্ষণ। জায়গাটা তাঁর পছন্দ হয়েছিলো। সেখানে তিনি অজু করে দুই রাকাত নামাজ পড়েছিলেন। সেখানকার কিছু মাটি তাঁর পাক দামনে লেগেছিলো। হজরত বলেছিলেন 'এখানকার মাটি আমাকে ছাড়তে চায় না।'

সেখানকার মাটি সত্যিই তাঁকে আর ছাড়লো না। পরম সোহাগভরে সেখানকার মাটি হজরত খাজা বাকী বিল্লাহ র. কে চিরতরে ধরে রাখলো।

তেত্রিশ

সময় যায়। সময় আসে।

কতো শত শত বিচিত্র অধ্যায় রচনা করে-সমাপ্ত করে সময় এগিয়ে চলে আপন গতিতে।

হজরত খাজা বাকী বিল্লাহ র. এর মোবারক স্মৃতি আজো বুকে করে ধরে রেখেছে গর্বিত দিল্লী। এখনও কোলাহলমুখর দিল্লীর মাঝে তাঁর রওজা, রওজা সংলগ্ন মসজিদে বিরাজ করে পবিত্র নীরবতা। এ নীরবতা যেনো হজরত খাজার দরবারের অতন্দ্র শাস্ত্রী।

দূর দূরান্ত থেকে আজও আশেকের দল তাঁর দরবারে এসে হাজির হন। প্রাণভরে দেখেন হজরত খাজার রওজার সবুজ গম্বুজ। আশেকের দগ্ধীভূত মন সেখানে সান্ত্বনা খোঁজে। মনে হয় হজরত খাজা বাকী বিল্লাহ্ র. এখানে আছেন। এই মসজিদে এই বিশাল কবরস্থানের প্রতিটি কোণায়, এখানকার মৌনতায়, এখানকার আকাশে বাতাসে। তিনি এখানে আছেন। এখনো আছেন।